পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	গ্রহণের তারিখ	পত্রাঙ্ক	প্রদ ত

শঙ্কর চরিত

শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য্য

২৮শে শ্রাবণ, ১৩৩৪ সাল।

প্রাপ্তিস্থান

উদ্বোধন কার্য্যালয়,

১নং মুখার্জ্জি লেন, বাগবাজার,

কলিকাতা।

[মূল্য ।৵০ আনা।

১নং মুখার্জ্জি লেন, বাগবাজার,
উদ্বোধন কার্য্যালয় হইতে
ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথ
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
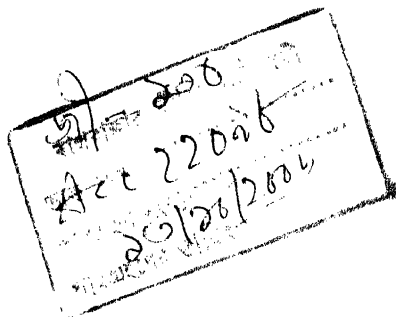
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস,
প্রিণ্টার—সুরেশচন্দ্র মজুমদার,
৭১।১নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
৫৮০।২৭

নিবেদন

যাহাদের বড় বই পড়িবার সুবিধা নাই এই বই তাহাদের জন্য লিখিত। ইহা দ্বারা আচার্য্যদেবের চরিত চিন্তা করিতে কাহারও বিন্দুমাত্র সহায়তা হইলে পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব।

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম,
শ্রীহট্ট।
২৮শে চৈত্র, ১৩৩৩ বাং

শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য্য।

ভূমিকা

কোন্ পথে জীবন পরিচালিত করিতে পারিলে মানব ইহ-পরলোকে যথাসম্ভব নির্ব্বিবাদে সুখভোগ করিয়া অন্তিমে সাক্ষাৎ নিঃশ্রেয়স মোক্ষলাভ করিতে সমর্থ হয়, সেই পথ যদি নির্ণয় করিতে হয় তাহা হইলে প্রথমে ভগবান্ শুকদেব এবং তৎপরে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের জীবন আমাদের বোধ হয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ। ভগবান্ শুকদেব ভগবদবতার কৃষ্ণদ্বৈপায়নের অশেষ তপস্যার ফল। ব্যাস আদর্শ জ্ঞানী পুত্র লাভার্থ যে তপস্যা করেন, তাহার ফল শুকদেব। আদর্শ জ্ঞানযোগী, সম্পূর্ণ নিষ্কলঙ্ক-জীবন, মোক্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতম আদর্শ অধিকারী ভগবান্ শুকদেব। পুরাণে আছে, শুকদেব মায়াময় সংসারে প্রবেশের ভয়ে মাতৃগর্ভেই বাস করিতে-ছিলেন, ভূমিষ্ঠ হন নাই। ব্যাসদেব সন্তানজন্মের ইহাই বিলম্বের হেতু জানিয়া ভগবান্ বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। তিনি ব্যাসের উপর দয়াপরবশ হইয়া গোশৃঙ্গে সর্ষপস্থিতিকালমাত্র সংসার হইতে মায়া অপসৃত করিতে সম্মত হন, আর মহাত্মা শুকদেব সেই অবসরে জন্মগ্রহণ করেন। শুকদেবের জ্ঞানযোগে শ্রেষ্ঠতম অধি-কার ও সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ জীবনের এই আখ্যায়িকাটি একটি পরি-চায়ক। আচার্য্য শঙ্কর এই শুকদেবের সম্প্রদায়ভুক্ত এবং অনেক বিষয়ে প্রায় একরূপ। উভয়ই নির্গুণ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মতত্ত্বে বিভোর, আকুমার ব্রহ্মচারী, জ্ঞানিগণ-শিরোমণি, নির্দ্দোষ-নিষ্কলঙ্ক-জীবন, শান্ত ধীর যোগী এবং ভক্ত। যে জীবনের অব্যবহিত পরে সাক্ষাৎ নির্ব্বাণমোক্ষ, উভয়ই সেইরূপ জীবন যাপন করিয়াছিলেন। বরং

ভূমিকা

কোন্ পথে জীবন পরিচালিত করিতে পারিলে মানব ইহ-পরলোকে যথাসম্ভব নির্ব্বিবাদে সুখভোগ করিয়া অন্তিমে সাক্ষাৎ নিঃশ্রেয়স মোক্ষলাভ করিতে সমর্থ হয়, সেই পথ যদি নির্ণয় করিতে হয় তাহা হইলে প্রথমে ভগবান্ শুকদেব এবং তৎপরে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের জীবন আমাদের বোধ হয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ। ভগবান্ শুকদেব ভগবদবতার কৃষ্ণদ্বৈপায়নের অশেষ তপস্যার ফল। ব্যাস আদর্শ জ্ঞানী পুত্র লাভার্থ যে তপস্যা করেন, তাহার ফল শুকদেব। আদর্শ জ্ঞানযোগী, সম্পূর্ণ নিষ্কলঙ্ক-জীবন, মোক্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতম আদর্শ অধিকারী ভগবান্ শুকদেব। পুরাণে আছে, শুকদেব মায়াময় সংসারে প্রবেশের ভয়ে মাতৃগর্ভেই বাস করিতে-ছিলেন, ভূমিষ্ঠ হন নাই। ব্যাসদেব সন্তানজন্মের ইহাই বিলম্বের হেতু জানিয়া ভগবান্ বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। তিনি ব্যাসের উপর দয়াপরবশ হইয়া গোশৃঙ্গে সর্ষপস্থিতিকালমাত্র সংসার হইতে মায়া অপসৃত করিতে সম্মত হন, আর মহাত্মা শুকদেব সেই অবসরে জন্মগ্রহণ করেন। শুকদেবের জ্ঞানযোগে শ্রেষ্ঠতম অধি-কার ও সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ জীবনের এই আখ্যায়িকাটি একটি পরি-চায়ক। আচার্য্য শঙ্কর এই শুকদেবের সম্প্রদায়ভুক্ত এবং অনেক বিষয়ে প্রায় একরূপ। উভয়ই নির্গুণ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মতত্ত্বে বিভোর, আকুমার ব্রহ্মচারী, জ্ঞানিগণ-শিরোমণি, নির্দ্দোষ-নিষ্কলঙ্ক-জীবন, শান্ত ধীর যোগী এবং ভক্ত। যে জীবনের অব্যবহিত পরে সাক্ষাৎ নির্ব্বাণমোক্ষ, উভয়ই সেইরূপ জীবন যাপন করিয়াছিলেন। বরং

বিচার করিলে কোন কোন বিষয়ে শঙ্করে শ্রেষ্ঠতাও দেখা যায়। শুক কোন জন্মে পার্ব্বতীর উদ্দেশ্যে কথিত শিবোক্ত জ্ঞানের কথা শুনিয়া জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু শঙ্কর শঙ্করেরই অবতার। শুক আচার্য্যের কর্ম্ম করেন নাই, বিশ্বগুরুর পদবীতে সমারূঢ় হন নাই, কিন্তু আচার্য্য শঙ্কর তাহা করিয়াছিলেন, তাহাও হইয়াছিলেন। একথা শঙ্করই নিজে বলিয়াছেন,

"কৃতে বিশ্বগুরু র্ব্রহ্মা ত্রেতায়াং ঋষিসত্তমঃ।
দ্বাপরে ব্যাস এব স্যাৎ কলাবত্র ভবাম্যহম্॥"

সত্যযুগে ব্রহ্মা বিশ্বগুরু, ত্রেতাতে ঋষিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ বিশ্বগুরু, দ্বাপরে ব্যাস এবং কলিতে আমি অর্থাৎ শঙ্করাচার্য্যই বিশ্বগুরু। বাস্তবিক যিনি অবতার হন তিনি নিজেই তাহা ঘোষণা করেন।

আজ এই আসুরিক বা ভৌতিক সভ্যতার দিনে যে পরপদানত হিন্দুর ধর্ম্ম মাথা তুলিয়া রহিয়াছে, অলৌকিক তত্ত্বের পরম রহস্যের জন্য যে সেই আসুরিক বলদৃপ্ত ভৌতিক সভ্যতাভিমানীর সন্তান হিন্দুর শাস্ত্র আলোচনা করিতেছে, তাহার কারণ অনেক পরিমাণে শঙ্করের কীর্ত্তি। তিনি যদি শাস্ত্র-রহস্য প্রকাশ না করিয়া বেদান্ত শাস্ত্রের ভাষ্য-টীকাদি না রচনা করিতেন, আর তিনি যদি ইহা বাদিদল বিদলিত করিয়া সর্ব্বসমক্ষে প্রচার ও প্রতিষ্ঠিত না করিয়া যাইতেন, তাহা হইলে তাঁহার পরবর্ত্তী যে সব মণীষিবর্গের জন্য ভারত গৌরব অনুভব করে তাঁহারা তাঁহাদের কর্ম্মক্ষেত্রই পাইতেন না। তাঁহারা বোধ হয় জন্মগ্রহণই করিতেন না। পরবর্ত্তী অনেক মনীষী তাঁহার মতের প্রতিবাদ করিয়া সাধারণের নিকট মহাগৌরবভাজন হইয়াছেন এবং এখনও অনেকে হইতেছেন।

বস্তুতঃ কাহার উপদেশ মানিয়া চলিব, ইহা যদি স্থির করিতে হয়, তাহা হইলে বোধ হয়, সর্ব্ববাদিসম্মত ইহাই হইবে যে, যিনি নিজে সাধক হইয়া সিদ্ধিলাভ করিয়া গ্রন্থ মধ্যে সত্য স্বয়ং লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাঁহারই উপদেশ পালনীয়। এই তিনটির একটি না থাকিলেই আর তাঁহার কথা মানিয়া চলা যায় না। কারণ সাধক-জীবন-শূন্য সিদ্ধ ব্যক্তি অর্থাৎ যাঁহারা আজন্ম সিদ্ধ, সাধনের অপেক্ষা যাঁহাদের নাই, তাঁহারা গ্রন্থ রচনা করিলে তাহা সাধকের অভাব-মোচনে ততদূর উপযোগী হয় না। রাজপুত্র যেমন দরিদ্রের দুঃখ বুঝে না সুতরাং মোচনে তত উদ্যোগী হয় না, ইহাও তদ্রূপ হইবার কথা। আর সিদ্ধ না হইয়া সাধক অবস্থায় গ্রন্থ লিখিয়া সত্য প্রচার করিলে তাহাও পালনীয় নহে। কারণ, তাহাতে ভ্রমপ্রমাদের সম্ভাবনা আছে। আর সাধক ব্যক্তি সিদ্ধ হইয়া গ্রন্থ না লিখিলে, কেবল মুখে মুখে উপদেশ দান করিলে তাঁহার উপদেশ কালে অত্যধিক বিকৃত হইয়া যায়। সুতরাং পরে তাঁহার মত বা সত্যনির্ণয় অসম্ভব হইয়া উঠে। এইজন্য এই তিনটির সামঞ্জস্য যাহাতে বর্ত্তমান—তিনিই আচার্য্য, তাঁহারই উপদেশ পালনীয়। তিনিই জগদ্‌গুরু বা বিশ্বগুরু হইবার যোগ্য। আর এই দৃষ্টিতে যদি দেখা যায়, তাহা হইলে অনেক মহাত্মাই, পূজনীয় হইলেও সাধারণ মানব জীবনের পথপ্রদর্শক হইতে পারেন না, তাঁহারা আচার্য্য বা জগদ্‌গুরু হইবার যোগ্য নহেন। আচার্য্য শঙ্করে এই তিনটি গুণ পূর্ণমাত্রায় বা আশাতীত মাত্রায় বর্ত্তমান ছিল। এইজন্যও আচার্য্যজীবন নিঃশ্রেয়সকামীর অত্যধিক অনুসরণীয়, অনুকরণীয় এবং অবলম্বনীয়।

সেই আচার্য্যেরই জীবনচরিত শ্রীযুক্ত ইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য্য

মহাশয় অতি সরল ভাষায় সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আশা করি, ইহা পাঠ করিয়া আচার্য্য শঙ্করের প্রকৃতভাব কতকটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। ইতি

কলিকাতা,
২৮।৩ ঝামাপুকুর লেন।
২৩শে বৈশাখ, ১৩৩৪ সাল।

বিনীত—
শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ।

জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য্য

শঙ্কর চরিত

প্রথম অধ্যায়

প্রয়োজন

ভগবান বুদ্ধদেব কঠোর তপস্যা করিয়া পরম শান্তি-ময় নির্ব্বাণ লাভ করেন। জীবের দুঃখে কাতর হইয়া, তিনি মানুষ মাত্রকেই নির্ব্বাণের পথে আহ্বান করিয়া-ছিলেন। তাহার ফলে কয়েক শত বৎসর মধ্যে ভারতের অধিকাংশ লোক বৈদিকধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বুদ্ধদেব প্রচারিত নির্ব্বাণ লাভের চেষ্টায় রত হইল। রাজসভা হইতে দরিদ্রের পর্ণকুটির পর্য্যন্ত রাজতনয় বুদ্ধদেবের চরিত কথায় মুখরিত হইয়া উঠিল। দেশের সর্ব্বত্র বৌদ্ধ বিহারাদির প্রতিষ্ঠা হইল। বৌদ্ধ শ্রমণগণ পৃথিবীর সর্ব্বত্র বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

নির্ব্বাণ লাভে মানুষের চির শান্তি হয় বটে, কিন্তু তাহা লাভ করিতে অনেক কষ্ট স্বীকারও করিতে হয়। বুদ্ধদেবের জীবনের জ্বলন্ত উদাহরণ যতই পুরাতন হইতে লাগিল, ততই লোকের নির্ব্বাণ লাভের আগ্রহও কমিয়া

আসিল। তপস্যার কঠোরতা শিথিল হইল, সন্ন্যাসীর আশ্রমে ভোগ ও আলস্য প্রবেশ করিল। ক্রমে ক্রমে ধর্ম্ম কেবল মতামত ও আচার মাত্রে পর্য্যবসিত হইল। তখন চতুর ভোগিলোক নিজের সুবিধানুযায়ী বুদ্ধদেবের উপদেশের নানারূপ ব্যাখ্যা করিতে লাগিল। তাহার ফলে কত শত অদ্ভুত মত ও বীভৎস ঘৃণ্য আচার, বৌদ্ধ-ধর্ম্মের নামে ও পোষাকে ভারতে সর্ব্বনাশের কারণ হইল। পরস্পর-বিরোধী সেই সব মত ও আচার লইয়া মানুষ ঈর্ষ্যায় জ্বলিতে লাগিল। নিজের সাধনপ্রণালী অনুষ্ঠান না করিয়া, তাহা যে অন্যের প্রণালী হইতে উৎকৃষ্ট, ইহা প্রমাণ করিতে লোক ব্যস্ত হইল। জ্ঞানলাভ, ভগবান-লাভের কথা ভুলিয়া গিয়া, মান-যশের জন্য কঠোর সাধন করিয়া নানারূপ শক্তিলাভের চেষ্টায় তাহারা উন্মত্ত হইয়া উঠিল। ধর্ম্ম একটা ব্যবসামাত্র হইল। চতুর লোক ভণ্ডামি করিয়া সমাজ-শিক্ষক গুরুর স্থান অধিকার করিল। ঋষিদের অনুভূত সত্য জানিতে না পারিয়া লোকে ভণ্ডদের মতকে বেদের ন্যায় মান্য করিতে লাগিল। সৎলোকের মান রহিল না।

বৌদ্ধ ধর্ম্মের সর্ব্বগ্রাসী প্রভাব সত্বেও কোনও কোনও স্থানে ব্রাহ্মণগণ বহু কষ্টে বেদচর্চ্চা ও বৈদিক ধর্ম্মানুষ্ঠান কিয়ৎপরিমাণে রক্ষা করিয়াছিলেন। দেশের এই দুর্দ্দিনে,

বৌদ্ধধর্ম্মের এই ঘোর অবনতির সময়, তাঁহারা আবার বেদ প্রচারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে সেই আন্দোলন প্রবল হইয়া উঠিল। শকাব্দের ষষ্ঠ-শতাব্দীতে প্রয়াগের কুমারিল ভট্ট বেদ প্রচারের জন্য দিগ্-বিজয়ে বহির্গত হইলেন।

কুমারিল ভট্ট

কুমারিল ভট্ট বেদাদি শাস্ত্রে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত, অত্যন্ত তেজস্বী ও বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডে নিষ্ঠাবান গৃহস্থ ব্রাহ্মণ। তিনি বৌদ্ধধর্ম্মের গ্লানিতে মানবের দুঃখ দেখিয়া শান্তিপ্রদ বৈদিক ধর্ম্ম প্রচারে কৃতসংকল্প হন। বৌদ্ধগণ অত্যন্ত কূট তার্কিক ছিলেন। ভট্টপাদ দেখি-লেন, তাঁহাদের শাস্ত্র ভালরূপে না জানিলে তাঁহাদের সঙ্গে তর্ক করিয়া বেদধর্ম্ম স্থাপন অসম্ভব। তাই তিনি বৌদ্ধ পণ্ডিতদের নিকট বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। সেই সময় একদিন বৌদ্ধগণ বেদের অত্যন্ত নিন্দা করিতে লাগিলেন। তাহাতে কুমারিলের এত কষ্ট হইল যে, তিনি, অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না। তাঁহাকে কাঁদিতে দেখিয়া বৌদ্ধগণ চমকিত হইলেন। তিনিও আর মনের ভাব গোপন করিয়া রাখিতে পারিলেন না; বেদ লইয়া বৌদ্ধদের সঙ্গে তর্কে প্রবৃত্ত হইলেন। কূট তার্কিক বৌদ্ধদের সঙ্গে তর্ক করিতে করিতে উত্তেজিত হইয়া

যে সব রাজা বৌদ্ধধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বৈদিক ধর্ম্ম গ্রহণ করেন তাঁহাদের মধ্যে কর্ণাটের রাজা সুধন্বার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কুমারিলের বহু পণ্ডিত শিষ্য ছিলেন। তন্মধ্যে প্রভাকর ও মণ্ডনমিশ্র সর্ব্বপ্রধান; মণ্ডনকে ভট্টপাদ আপন অপেক্ষা অধিক ধীমান্ বলিয়া মনে করিতেন।

কুমারিল গুরু-দ্রোহ পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তুষানলে তনুত্যাগ করেন। তিনি বৌদ্ধ আচার্য্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন; পরে পণ অনুসারে গুরুবধের হেতু হন। কাহারও মতে বৌদ্ধসংঘ তাঁহার গুরুকুল, সেই কুলের ধ্বংস করাই তাঁহার গুরুদ্রোহ।

বৌদ্ধধর্ম্মের শেষ ফল যাহাই হউক, একটা উচ্চ চিন্তা উচ্চ আকাঙ্ক্ষা দেশময় যে প্রচারিত হইয়াছিল তাহা আর লোপ পায় নাই। কুমারিল বৌদ্ধমত নিরস্ত করিলেন বটে, কিন্তু মানুষের বুদ্ধি হইতে নির্ব্বাণের মহত্ত্ব-বোধ দূর করিতে পারিলেন না। আর, তিনি কেবলমাত্র বেদের কর্ম্মকাণ্ডই প্রচার করেন। সুতরাং মানুষের উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে ও সর্ব্বজনের উপযোগী বেদধর্ম্ম প্রচার করিতে আর একজন মহাপুরুষের প্রয়োজন হইল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আবির্ভাব

ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম-সীমান্তে কেরল দেশে মালা-বার প্রদেশ। সেখানে বৈদিক ধর্ম্মপরায়ণ নম্বুরি বা নম্বুত্তরি ব্রাহ্মণগণ অতি প্রাচীনকাল হইতে বাস করি-তেছেন। তাঁহারা না-কি ভৃগুরামের আহ্বানে আর্য্যাবর্ত্ত হইতে কেরল দেশে গিয়া বাস করেন। তদবধি তাঁহারা এখন পর্য্যন্ত প্রাচীন বেদাচার রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। শকাব্দের ষষ্ঠ-শতাব্দীতে কালাডি গ্রামের নম্বুরি ব্রাহ্মণ-বংশে শিবগুরু নামে এক তপস্বী ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার পত্নী বিশিষ্টা দেবী তাঁহারই ন্যায় ভক্তিমতী ছিলেন। উভয়ে জপতপেই কাল কাটাইতেন। শিব-গুরুর বিবাহ করিবার ইচ্ছা ছিল না। পিতার এক-মাত্র পুত্র বলিয়া পিতার বিশেষ আগ্রহে বিবাহ করেন। কিন্তু সন্তান-সন্ততি কিছুই হইল না। শেষ বয়সে পুত্র-লাভের জন্য পতি পত্নী শিবের আরাধনা করেন। শিবের বরে তাঁহাদের এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিল। সে-দিন ৬০৮ শকাব্দের (৬৮৬ খৃঃ অঃ) ১২ই বৈশাখ

শুক্লা তৃতীয়া তিথি।* শিবগুরু ইষ্টদেবের নামানুসারে পুত্রের নাম রাখিলেন শঙ্কর।

শঙ্কর অতি শিশুকালেই অমানুষিক প্রতিভার পরিচয় দিলেন। এক বৎসর পূর্ণ হইতে না হইতে মাতৃভাষায় সকলের ন্যায় কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন। দুই তিন বৎসর মাতাপিতার মুখে পুরাণের গল্প শুনিয়া অবিকল পুনরাবৃত্তি করিতে সমর্থ হইলেন। তিনি শ্রুতিধর ছিলেন; যাহা শুনিতেন তাহাই মনে রাখিতে পারিতেন। তাঁহার তিন বৎসর বয়স হইতে না হইতে শিবগুরু দেহত্যাগ করিলেন। বংশের রীতি অনুসারে বিশিষ্টাদেবী পুত্রকে পঞ্চমবর্ষে উপনয়ন দিয়া বেদপাঠের জন্য গুরুগৃহে প্রেরণ করিলেন। শঙ্কর গুরুমুখে শাস্ত্রবাক্য শুনিবামাত্র অসামান্য স্মৃতি ও বুদ্ধিবলে তাহার অর্থ বুঝিয়া কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিলেন। গুরু চমৎকৃত হইয়া অতি আনন্দের সহিত অনবরত শিক্ষাদান করিতে লাগিলেন। দুই বৎসর মধ্যে শঙ্করের বেদবেদাঙ্গ পাঠ সমাপ্ত হইল। তখন তাঁহার বয়স সাত বৎসর মাত্র।

বৈদিক ধর্ম্মানুসারে শিক্ষার সময় সহিষ্ণুতা ও বিনয় অভ্যাসের জন্য ছাত্রগণকে ভিক্ষা করিয়া খাইতে হয়। একদিন শিশু-শঙ্কর ভিক্ষা করিতে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের

* মতান্তরে শুক্লাপঞ্চমী।

গৃহে উপস্থিত হন। শিশু-শঙ্করের প্রতিভাদীপ্ত মুখমণ্ডল দেখিয়া ব্রাহ্মণীর হৃদয় স্নেহে গলিয়া গেল, কিন্তু তাঁহার গৃহে শঙ্করকে দিবার মত কিছুই ছিল না। শঙ্কর 'মা' বলিয়া ভিক্ষা চাহিলে, 'কিরূপে এই প্রাণমনোহারী বালককে বিমুখ করিবেন' এই ভাবিয়া ব্রাহ্মণী কাঁদিতে কাঁদিতে কয়েকটি আমলকী ভিক্ষাস্বরূপ শঙ্করকে দিলেন। শঙ্করের সরল শিশুহৃদয়ে বড় আঘাত লাগিল। শিশুকাল হইতে মাতাপিতার নিকট পৌরাণিক গল্প শুনিয়া দেবদেবীর উপর তাঁহার পূর্ণ বিশ্বাস হইয়াছিল। তিনি মা লক্ষ্মীকে ব্যাকুল হইয়া প্রার্থনা করিলেন, "অচিরে যেন ব্রাহ্মণীর দুঃখ দূর হয়।" অল্পদিনের মধ্যে ঘটনাচক্রে ব্রাহ্মণ-দম্পতির অবস্থা ফিরিয়া গেল। কেহ কেহ লিখিয়াছেন, ব্রাহ্মণের প্রাঙ্গণে সোনার আমলকী বৃষ্টি হইয়াছিল।

গুরুদক্ষিণা দিয়া শঙ্কর গৃহে ফিরিলেন। শাস্ত্রপাঠ ব্যতীত অন্য কোনও বিষয়ে তাঁহার মনোযোগ ছিল না। দিবানিশি পুস্তকরাশির মধ্যে যেন তিনি ডুবিয়া থাকিতেন। সাত বৎসরের শিশু অসাধারণ পণ্ডিত হইয়াছে, এই সংবাদ চারিদিকে প্রচার হইয়া গেল। তাঁহাকে দেখিবার জন্য দলে দলে লোক আসিতে লাগিল। পণ্ডিত বিদ্যাপরীক্ষা করিতে, কৌতূহলী অদ্ভুত বালক

দেখিতে, ভক্ত উপহার দিতে আসিলেন। সকলেই আশাতিরিক্ত আনন্দ লইয়া ফিরিলেন। অনেক ছাত্রও না-কি তাঁহার নিকট শিক্ষালাভ করিতে আরম্ভ করিল।

কেরল-রাজের নিকট এই সংবাদ পৌঁছিতে বিলম্ব হইল না। তিনি অতি পণ্ডিত ও সজ্জন ছিলেন, কাজেই শঙ্করকে দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। শঙ্করের নিকট রাজার নিমন্ত্রণ যাইলে তিনি রাজসভায় যাইতে সম্মত হইলেন না। রাজা ইহাতে ক্রুদ্ধ বা বিরক্ত না হইয়া, অতি আগ্রহের সহিত শিশু-পণ্ডিতকে দেখিবার জন্য নিজেই তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি শঙ্করের অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি, শাস্ত্রের মর্ম্ম বুঝিবার অসাধারণ ক্ষমতা এবং তাহা ব্যাখ্যা করিবার অপূর্ব্ব কৌশল দেখিয়া চমৎকৃত ও মোহিত হইলেন। গুণিলোককে পুরস্কৃত করা রাজার কর্ত্তব্য; তাই তিনি শঙ্করকে বহু ধন দিতে চাহিলেন। শঙ্কর কিছুই গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না, সমুদয় ধন দরিদ্রদিগকে দান করিতে উপদেশ দিলেন।

আলোয়াই নদী তখন শঙ্করের বাড়ী হইতে দূরে ছিল। ইহার জল অতি পবিত্র বলিয়া বৃদ্ধা বিশিষ্টা-দেবী প্রত্যহ নদীতে স্নান করিতে যাইতেন। একদিন গ্রীষ্ম-কালে তাঁহার স্নান করিয়া ফিরিতে অত্যন্ত বিলম্ব হইতেছে

দেখিয়া শঙ্কর মাকে খুঁজিতে বাহির হইলেন। কিছু দূরে গিয়া তিনি দেখিলেন, জননী মূর্চ্ছিতা হইয়া মাটীতে পড়িয়া আছেন। এই দৃশ্যে তিনি বড়ই ব্যথিত হইলেন। সেবা-শুশ্রূষা করিয়া মার মূর্চ্ছা ভঙ্গ করতঃ কষ্টেসৃষ্টে মাকে বাড়ীতে লইয়া আসিলেন, আর সরল প্রাণে নদীর নিকট প্রার্থনা করিলেন, 'যেন কাল হইতে নদী তাহার গৃহের নিকট দিয়া প্রবাহিত হয়।' বিশ্বাসের অসাধ্য কিছুই নাই। পরদিন গ্রামবাসী ঘুম হইতে উঠিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া দেখিল, আলোয়াই নদীর স্রোত শঙ্করের বাড়ীর পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত। বৃদ্ধা বিশিষ্টা-দেবীর যাতায়াতের কষ্ট দূর হইল। এই সব ঘটনায় তাঁহার আনন্দ হইত বটে কিন্তু কি এক আশঙ্কা ও ভয় মাঝে মাঝে হৃদয়ে উদিত হইয়া তাঁহাকে বিষাদিত করিত।

শঙ্করের অমানব প্রতিভা সমাজের সর্ব্বপ্রকার লোককেই আকর্ষণ করিত। একদিন কয়েকজন জ্যোতি-র্বিবদ পণ্ডিত শঙ্করের কোষ্ঠীগণনা করিয়া দেখিবার জন্য কৌতূহলী হইয়া আসিলেন। মাতার নিকট অনুসন্ধান করিয়া শঙ্কর তাহা পণ্ডিতগণকে দেখাইলেন। মাতাও অসাধারণ পুত্রের ভবিষ্যৎ জানিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইলেন। পণ্ডিতগণ শঙ্করের জাতপত্র গণনা করিয়া

অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন, কারণ এমন রাশিনক্ষত্রের সমাবেশ মানুষের ভাগ্যে ঘটে না। মাতাও শুনিতে শুনিতে উৎফুল্ল হইলেন। সহসা পণ্ডিতগণ বিমর্ষ ও গম্ভীর হইয়া পরস্পরের প্রতি ইঙ্গিত করতঃ গণনা বন্ধ করিলেন। মাতৃহৃদয় আশঙ্কায় কম্পিত হইয়া উঠিল। বিশিষ্টা-দেবী পণ্ডিতগণকে সব কথা খুলিয়া বলিবার জন্য জেদ করিতে লাগিলেন। পুত্রের অমঙ্গলের কথা মায়ের নিকট প্রকাশ করা বড় কঠিন। আবার যে ঘটনা অল্পদিন পরেই ঘটিবে তাহা গোপন করিয়াই বা ফল কি? আবার, যে ভাবে সহসা গণনা বন্ধ করিতে হইল, বৃদ্ধার মনে দারুণ আশঙ্কা না হইবেই বা কেন?—এইরূপ সাতপাঁচ ভাবিয়া পণ্ডিতগণ প্রকাশ করিয়া বলিলেন যে, শঙ্করের আয়ু আট বৎসর মাত্র; তবে তপস্যায় আরও আট বৎসর বর্দ্ধিত হইতে পারে।

যাঁহার মৃত্যুর আর কয়েকদিন মাত্র বাকী আছে, তাঁহার এবং তাঁহার মাতার মনের অবস্থা সহজেই অনুমান করা যায়। বিশেষতঃ বিশিষ্টা-দেবীর একপুত্র বই আর নাই এবং সে পুত্র রূপেগুণে সর্ব্বজন-মনোহারী। আর শঙ্কর বেদ-বেদান্ত পাঠে জানিয়াছেন যে, ভগবান লাভ না করিয়া দেহত্যাগ অশেষ দুঃখের হেতু। মাতা ব্যাকুল হইয়া ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন। শঙ্কর

ভাবিলেন, এত অল্প সময়ের মধ্যে ভগবানলাভ অসম্ভব; তবে সন্ন্যাস লইতে পারিলে পরকালে সদ্গতি হইবে। এই ভাবিয়া তিনি মনের ভাব মায়ের নিকট প্রকাশ করিলেন। মায়ের পক্ষে এই অবস্থায় কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সহজ নহে। একদিকে মৃত্যু, অপরদিকে সন্ন্যাস। দারুণ দুশ্চিন্তায় মাতা-পুত্রের দিন কাটিতে লাগিল।

একদিন শঙ্কর স্নান করিতে আলোয়াই নদীতে নামিয়াছেন, সহসা এক কুমীর তাঁহাকে আক্রমণ করিল। তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তথায় উপস্থিত লোক সকল কোলাহল করিতে লাগিল; কিন্তু কেহই নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া শঙ্করকে রক্ষা করিতে সাহস পাইল না। গোলমাল শুনিয়া মাতা ছুটিয়া আসিলেন। তখন কুমীর শঙ্করকে গভীর জলে লইয়া যাইতেছে এবং শঙ্কর "মা, সন্ন্যাস দাও, মা, সন্ন্যাস দাও"—বলিয়া চীৎকার করিতেছেন। জননীর বুঝিতে বাকী রহিল না যে, পুত্রের আয়ু নিঃশেষ। তখন আর ভাবিবার সময় ও সামর্থ্য নাই। তিনি সন্ন্যাসের অনুমতি দিয়া অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মাতার অনুমতি পাইয়া শঙ্কর মনে মনে সন্ন্যাস গ্রহণ করিবামাত্র কুমীর তাঁহাকে ছাড়িয়া দিল। তিনি সাঁতার দিয়া তীরে

আসিয়া উঠিলেন। সকলের শুশ্রূষায় বিশিষ্টা-দেবীরও মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল।

মূর্চ্ছাভঙ্গে পুত্রমুখ দেখিয়া বিশিষ্টা-দেবীর প্রাণ শীতল হইল; কিন্তু তৎক্ষণাৎ পুত্রের সন্ন্যাসের কথা মনে পড়ায় প্রবল শোকে বৃদ্ধার হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। এই হৃদয়-বিদারক ঘটনা যে দেখিল সেই শোকার্ত্ত হইল। শঙ্কর জ্ঞাতিগণকে সমুদয় বিষয় সম্পত্তি দান করিয়া তাঁহাদের হস্তে মাতার রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিলেন। সম্পত্তির লোভে জ্ঞাতিগণ বিশিষ্টা-দেবীকে নানারূপে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই তাঁহার মন প্রবোধ মানিল না। শঙ্কর অনেক কাকুতি-মিনতি করিয়া তিনটি প্রতিজ্ঞা করিলেন;—

(১) তিনি মৃত্যুকালে মাকে দর্শন দিবেন।

(২) তাঁহাকে মৃত্যুকালে ভগবান দর্শন করাইবেন।

(৩) স্বয়ং তাঁহার সৎকার করিবেন।

ইহাতে বৃদ্ধা কিয়ৎপরিমাণে শান্ত হইয়া শঙ্করকে গৃহত্যাগের অনুমতি দিলেন। অষ্টম বর্ষবয়স্ক শিশু-শঙ্কর মাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া মানব জীবনের সর্ব্বোচ্চ আদর্শ লাভের জন্য কঠিনতম পথে যাত্রা করিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়

দিব্য কর্ম্ম

নর্ম্মদাতীর যোগীদিগের সাধনার স্থান। সহস্র সহস্র বৎসর যাবৎ কত যোগী এই স্থানে সাধনা করিয়া সিদ্ধি-লাভ করিয়াছেন। শঙ্করের জন্মের প্রায় সহস্র বৎসর পূর্ব্ব হইতে গোবিন্দ-যোগী নামে এক সিদ্ধপুরুষ নর্ম্মদা তীরে একটি গুহায় সমাধিমগ্ন ছিলেন। শুকদেবের শিষ্য পর-ম্পরায় গৌড়পাদ নামে একজন প্রসিদ্ধ যোগী ছিলেন। গোবিন্দপাদ তাঁহারই শিষ্য। কেহ কেহ তাঁহাকে মহর্ষি পতঞ্জলি বলিয়াও মনে করিতেন। এইরূপ প্রবাদ ছিল যে, কোনও দেবকার্য্য সাধনের জন্য যোগী সমাধিস্থ ছিলেন; যে ব্যক্তি নর্ম্মদার জলস্রোত একটি কুম্ভমধ্যে পুরিয়া রাখিতে পারিবে, সে আসিয়া শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলে এই যোগীর সমাধিভঙ্গ হইবে। ইঁহার সমাধিভঙ্গে জ্ঞান-লাভের আশায় অথবা অহৈতুকী ভক্তির জন্য অনেক সাধক গুহার নিকটে বাস করিতেন।

শঙ্কর, গোবিন্দ-যোগীর নাম শুনিয়াছিলেন। সময় সময় কি এক অজ্ঞাত কারণে সেই যোগীকে দেখিবার

জন্য তাঁহার মনে প্রবল আকাঙ্ক্ষা হইত। এখন গৃহ-ত্যাগ করিয়া গোবিন্দপাদকেই তিনি মনে মনে গুরুপদে বরণ করিলেন। তাঁহার মত শিশুর পক্ষে এতদূরে একাকী পায়ে হাঁটিয়া যাওয়া যে কত কঠিন ব্যাপার, তাহা তিনি একবারও ভাবিয়া দেখিলেন না। তিনি নর্ম্মদাতীর লক্ষ্য করিয়া অনবরত উত্তরদিকে চলিতে লাগিলেন।

শঙ্কর কত নদী, পর্ব্বত, নগর, প্রান্তর অতিক্রম করিয়া, কত লোকের নিষেধ বাধা না মানিয়া, কত অনিদ্রা অনাহার সহ্য করিয়া, বহুদিনে নর্ম্মদাতীরে গোবিন্দপাদের গুহায় উপস্থিত হইলেন। তিনি গুহা প্রদক্ষিণ করতঃ তাহাতে প্রবেশ করিয়া ভক্তি-গদগদ কণ্ঠে গুরুদেবকে স্তুতি করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে গোবিন্দপাদের সমাধি ভঙ্গ হইল। শঙ্কর কি উৎসাহ লইয়া, কত উদ্যমে গুরুর দর্শন পাইয়াছেন! এখন তাঁহার সমাধিভঙ্গে আনন্দে আত্মহারা হইয়া তাঁহার চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণতি করিয়া তিনি আত্মসমর্পণ করিলেন। গুহার সন্নিকটে অবস্থিত যোগিগণ এ দৃশ্যে আশ্চর্য্যা-ন্বিত হইলেন।

গুরু শিষ্য উভয়েই উভয়কে পাইয়া পরম প্রীত হইলেন। সমাধি হইতে ব্যুত্থিত যোগী শুদ্ধচিত্ত লোক

ব্যতীত কাহারও সঙ্গ সহ্য করিতে পারেন না ; আবার শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি সিদ্ধপুরুষ ব্যতীত অন্যকে গুরুর আসন প্রদান করিতে পারেন না। গোবিন্দ দেখিলেন, এই শিশু-মূর্ত্তির দেহমন অতি পবিত্র, পূর্ণজ্ঞান ধারণে সমর্থ ; যাহার জন্য সহস্র বৎসর ধরিয়া তিনি মানবদেহে অপেক্ষা করিতেছিলেন ইনিই সেই ব্যক্তি। শঙ্কর বুঝিলেন, শাস্ত্রে সদ্‌গুরুর যে সব লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে ইনি সেই সব লক্ষণযুক্ত গুরু। শিষ্য গুরুর সেবায় মনপ্রাণ অর্পণ করিলেন। আর গুরু শিষ্যকে অধ্যাত্মবিদ্যায় পারদর্শী করিয়া তুলিতে সযত্ন হইলেন।

একদা বর্ষাকালে কয়েকদিন ধরিয়া অনবরত বৃষ্টি হওয়ায় নর্ম্মদার জল অত্যন্ত বাড়িয়া গেল। একদিন, গোবিন্দপাদ গুহামধ্যে সমাধিমগ্ন আছেন। এমন সময়, দেখা গেল নর্ম্মদার জলস্রোত ভয়ানক বর্দ্ধিত হইয়া গুহা ডুবাইয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছে। শিষ্যগণ এই অবস্থায় কি করা কর্ত্তব্য কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না। সমাধিস্থ গুরুদেবকে বহন করিয়া স্থানান্তরিত করা ছাড়া আর কোনও উপায় রহিল না। বালক শঙ্কর কিন্তু এই সব পরামর্শে যোগদান না করিয়া এক স্বতন্ত্র উপায় অবলম্বনে রত হইলেন। তিনি একটি কলসী সংগ্রহ করিয়া গুহার মুখে স্থাপন করিলেন,

এবং পূর্ব্বে যেরূপ সরল বিশ্বাসে আলোয়াই নদীকে স্রোতের গতি পরিবর্ত্তন করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, সেইরূপ দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত নর্ম্মদাকেও এই কুম্ভ মধ্যে প্রবেশ করিয়া স্থির হইতে অনুরোধ করিলেন। জল-স্রোত তৎক্ষণাৎ সরু হইয়া, তীব্র বেগে, কলকল শব্দে কলসীতে প্রবেশ করিতে লাগিল, একবিন্দু জলও কলসী হইতে উপচিয়া পড়িল না। শঙ্করের অসাধারণ যোগ-শক্তি দর্শনে সকলে স্তম্ভিত হইলেন।

শাস্ত্রপাঠ-কালে যেমন শুনিবামাত্র শিক্ষা শেষ হইত, সাধন বিষয়েও তেমনি গুরুর উপদেশ অনুসারে চেষ্টা করিবামাত্র শঙ্করের মন সমাধিমগ্ন হইতে লাগিল। গভীর হইতে গভীরতর সমাধির সোপানপরম্পরা অনায়াসে অতিক্রম করিয়া শঙ্কর নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ করিলেন। তখন তিনি এমন এক বস্তু অনুভব করিলেন, যাহার আদি, মধ্য বা অন্ত নাই, সুতরাং তাহা ব্যতীত অন্য কিছুরই অনুভব হয় না। সেখানে কেবল এক অন্তহীন বাধাহীন নিরন্তর অনুভব। মন নাই, সুতরাং অন্য কোনও বস্তুর স্মৃতিও নাই। ভোগ করিবার কেহ নাই, তাই সুখ নাই, দুঃখ নাই, কেবল এক অনন্ত শান্তি বিরাজমান; তাহা এক অখণ্ড সত্তা, এক বাধাহীন জ্ঞান, এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ মাত্র।

শিষ্যের চরম সমাধি, পূর্ণ জ্ঞানলাভে গোবিন্দপাদের আনন্দের সীমা রহিল না। গত সহস্র বৎসর কালের করাল আক্রমণ হইতে যে মহারত্ন তিনি এত যত্নে হৃদয়ে পূরিয়া রক্ষা করিয়াছেন, তাহা আজ উপযুক্ত শিষ্যের হস্তে ন্যস্ত করিয়া দায়মুক্ত হইলেন। যে দেব-কার্য্য সাধনের জন্য শঙ্কর অবতীর্ণ তাঁহাকে সেই কার্য্যে উদ্‌বুদ্ধ করিতে গোবিন্দ এখন সংকল্প করিলেন।

শঙ্করের মনপ্রাণ সমাধি-সাগরে অনন্ত আনন্দ-রসে নিমগ্ন ছিল, কিন্তু কি এক অজ্ঞাত অনির্ব্বচনীয় আকর্ষণে তাহা আবার মানব-লোকে 'ব্যুত্থিত' হইল। তখন তিনি সমস্ত জগৎ মরীচিকার ন্যায় মিথ্যা বোধ করিতে লাগিলেন; 'আর সর্ব্বজীব মায়ায় বদ্ধ হইয়া বৃথা কষ্ট পাইতেছে', এই ভাবনায় তাঁহার হৃদয়ে এক করুণার উচ্ছ্বাস উত্থিত হইল।

যোগী গোবিন্দপাদ তাঁহাকে বলিলেন, "দ্বাপরের শেষে ব্রহ্মবিদ্যা লোপ হইলে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তপস্যার দ্বারা তাহার পুনরুদ্ধার করেন। সমগ্র বেদপাঠ করিয়া তাহার মর্ম্ম অবধারণ করা সাধারণ লোকের অসাধ্য দেখিয়া 'ব্রহ্মসূত্রে' তাহা তিনি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়া শিষ্যদিগকে শিক্ষা দেন। আমি গুরুপরম্পরাগত বেদের মর্ম্মার্থসহ সেই ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করি। বৌদ্ধ বিপ্লবের

পর বেদ উদ্ধারের জন্য তুমি আবির্ভূত হইলে, তোমাকে এই বিদ্যা প্রদানের জন্য আমি গুরু কর্ত্তৃক আদিষ্ট হই। তাই সহস্র বৎসর তোমার অপেক্ষায় আমি এই গুহায় সমাধিমগ্ন ছিলাম। এখন তুমি ব্যাসের মতানুযায়ী একটি ভাষ্য রচনা কর এবং বেদের মর্ম্মার্থসহ শিষ্যদিগকে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দিয়া তোমার জীবনের উদ্দেশ্য সফল কর।" এই বলিয়া তিনি নিজ শিষ্যগণের শিক্ষার ভার শঙ্করের হস্তে ন্যস্ত করিলেন এবং কাশীধামে গিয়া কার্য্য আরম্ভ করিতে উপদেশ দিয়া মহাসমাধি অবলম্বন করিলেন।

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে যেমন বৈদিক ধর্ম্ম লুপ্ত প্রায় হইয়াছিল, তেমনই তীর্থ সমূহও পরিত্যক্ত ও বিস্মৃত হইয়াছিল। প্রবাদ আছে যে, কাশীধাম না-কি তখন অরণ্যে পরিণত হইয়াছিল। রাখালগণ তথায় গরু চরাইত। প্রবাদটি সম্পূর্ণ সত্য না হইলেও কাশীধামের অবস্থা যে তখন খুব খারাপ ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

শঙ্কর গুরুভ্রাতাগণে বেষ্টিত হইয়া কাশীধামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভিক্ষাদি সমাপনান্তে বালক শঙ্কর যখন বৃদ্ধ প্রৌঢ় যুবক সন্ন্যাসী সকলের মধ্যে বসিয়া বেদান্ত ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন তখনকার অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া লোক সকল আশ্চর্য্যান্বিত হইল। এই সংবাদ

চারিদিকে রাষ্ট্র হইলে শঙ্করকে দেখিবার জন্য দলে দলে লোক আসিতে লাগিল।

নির্ব্বিকল্প সমাধিযোগে নির্গুণ ব্রহ্মের অনুভব করায় শঙ্কর বোধ করিতে লাগিলেন, এই জগৎ স্বপ্নদৃষ্ট নগরীর ন্যায় নিতান্ত অলীক, মরুমরীচিকার ন্যায় ভ্রান্তি মাত্র; ইহা আপনা আপনি উচ্ছ্বসিত উদ্বেলিত এক জড় সমুদ্র, ইহাতে চৈতন্যের লেশ মাত্র নাই; ইহার কোন প্রয়োজন নাই, কোনও উদ্দেশ্য নাই; এই দেহ, এই মন, এই বুদ্ধি, এই অহঙ্কার, সবই ভ্রম, কঠোর বৈরাগ্য সহায়ে তাহাদের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া নির্গুণ ব্রহ্ম-সমুদ্রে লীন হওয়াই মানুষের শান্তিলাভের একমাত্র উপায়। ভক্তি উপাসনার কথা তাঁহার মনে উঠিল না। চিত্ত সমাধি-সাগরে অবগাহন হইতে বিরত হইতে চাহিল না। কি এক অনির্ব্বচনীয় কারণে চিৎ-সমুদ্রে অবিদ্যার ছায়া পড়িয়া "আমি, আমি" বোধ আসিয়া উপস্থিত হইলে, একটা করুণার হিল্লোল উঠিতে না উঠিতে মিলাইয়া যাইতে লাগিল; জগৎ কল্যাণের ভাব মনে উঠিলেও কঠোর বৈরাগ্য আসিয়া তাহা গ্রাস করিয়া ফেলিল। কেবল তিনি গুরুর আদেশ স্মরণে যন্ত্রবৎ শিষ্যদিগকে উপদেশ দিতে লাগিলেন, ইহাতে তাঁহার আগ্রহ, উদ্যম কিছুই ছিল না।
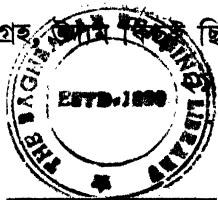
শঙ্করের এই উদাসীন ভাব দূর করিতে এবং তাঁহার চিত্তে জগৎ-কল্যাণের প্রবল আগ্রহ জাগাইতে কাশীশ্বরী মাতা অন্নপূর্ণা এক বিচিত্র উপায়ে তাঁহাকে শক্তিতত্ত্ব, সগুণ ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝাইয়া দিলেন।

একদিন শঙ্কর গঙ্গাস্নানে যাইবার সময় দেখিলেন, এক যুবতী, মৃত স্বামীকে পথের মধ্যস্থানে রাখিয়া তাহার সৎকারের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিতেছে। গমনাগমনের অসুবিধা হইতেছে দেখিয়া শঙ্কর যুবতীকে শবদেহ এক-পাশে সরাইয়া লইতে বলিলেন।

যুবতী বলিল, "উহাকেই বল না, বাবা।"

যুবতীর বোকামিতে বিরক্ত হইয়া শঙ্কর বলিলেন, "এই শবদেহে কি নড়িবার শক্তি আছে? ওটা সরাইয়া লও।"

যুবতী পূর্ব্ববৎ গম্ভীর ভাবে বলিল, "শক্তি না থাকিলে কি একটুও সরা যায় না?"

শঙ্কর এই অদ্ভুত উত্তরে আরও উত্যক্ত হইয়া বলিলেন, "কি অসম্ভব কথা বলিতেছ?"

যুবতী বলিল, "অসম্ভব কেন হবে, বাবা? আদি অন্ত রহিত এই প্রকৃতি যদি শক্তিহীন চৈতন্যহীন হইয়াও নড়িতে চড়িতে পারে তবে এতটুকু এই শবদেহ সরিতে পারিবে না কেন?"

শঙ্কর এই কথায় চমকিয়া উঠিলেন। তাঁহার মনে শাস্ত্রোক্ত সগুণ ব্রহ্মের কথা যে মাঝে মাঝে উঠিত না তাহা নহে, কিন্তু নির্গুণ ব্রহ্মানুভূতির ঝোঁকে এতকাল সেই বিষয়ে বড় মনোযোগ দিতে পারেন নাই; অথবা শাস্ত্র-জ্ঞান হইতে অনুভব শ্রেষ্ঠ ভাবিয়া নিজে যাহা দেখিতেন তাহাই সত্য বলিয়া মনে করিতেন। তিনি এই চিন্তায় একটু তন্ময় হইলে সেই শব ও যুবতী অদৃশ্য হইল আর সহসা যেন তাঁহার নয়ন হইতে এক পর্দ্দা সরিয়া গেল। তিনি দেখিলেন, সেই নির্গুণ ব্রহ্ম ঊর্দ্ধ অধঃ পরিপূর্ণ করিয়া এক বিরাট মূর্ত্তিতে গুণময় হইয়া বিরাজ-মান; এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার দেহ; তিনি লীলার ছলে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কার্য্যে রত; জলে স্থলে অনলে অনিলে তাঁহার শক্তি, তাঁহার কার্য্য প্রকাশমান। শঙ্করের হৃদয়ে সাগরোচ্ছ্বাসের ন্যায় এক ভক্তির উচ্ছ্বাস উত্থিত হইল, শরীর কণ্টকিত হইল, ঝর ঝর করিয়া অশ্রুপাত হইতে লাগিল, অন্তরে বাহিরে আদ্যাশক্তিকে অনুভব করিয়া তিনি অস্ফুট স্বরে "মা" "মা" বলিয়া ব্যাকুল হইলেন। এই শব ও যুবতীর দৃশ্য তাঁহার হৃদয়ে নির্গুণ নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম ও সগুণা ক্রিয়াশীলা ব্রহ্মশক্তির ভাব সুদৃঢ় মুদ্রিত করিয়া দিল।

শঙ্কর, গোবিন্দপাদের উপদেশে নির্ব্বিকল্প সমাধি-

যোগে নির্গুণ ব্রহ্ম বোধ করিয়াছিলেন। এখন মহামায়ার কৃপায় সগুণ ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করিলেন। জ্ঞানের পূর্ণ পরিণতিতে, পরিপক্ক অবস্থায় যে সর্ব্বত্র ব্রহ্মবোধ তাহা এখনও তাঁহার বাকী আছে। সহজ অবস্থায় এখনও ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, ত্যাজ্য গ্রাহ্যভাব তাঁহাকে পীড়িত করে। যিনি বেদ উদ্ধারের জন্য অবতীর্ণ, তাঁহাকে জ্ঞানের চরমসীমায় যাইতে হইবে। তাই মহাদেব এবার স্বয়ং শঙ্করের শিক্ষার ব্যবস্থায় প্রবৃত্ত হইলেন।

একদিন গঙ্গাতীরে যাইবার পথে শঙ্কর এক চণ্ডালের সম্মুখীন হইলেন। চণ্ডাল চারিটি কুকুর লইয়া মাতাল অবস্থায় পথ জুড়িয়া আসিতেছিল। কুকুর ও চণ্ডালের স্পর্শভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া শঙ্কর পথের একপাশে সরিয়া দাঁড়াইয়া চণ্ডালকে পথ ছাড়িয়া দিতে বলিলেন। কিন্তু চণ্ডাল পূর্ব্ববৎ চলিতে চলিতে বেদান্তের উচ্চতত্ত্ব বলিতে লাগিল। সে বলিল, "কে কাহাকে স্পর্শ করিবে? এক বই দুই বস্তু কোথায়? তুমি কাহার স্পর্শভয়ে সঙ্কুচিত হইতেছ? আত্মা ত কাহাকেও স্পর্শ করেন না, অন্যের দ্বারা স্পৃষ্ট হইতে পারেন না।" চণ্ডালের মুখে এইরূপ জ্ঞানের কথা শুনিয়া শঙ্কর অদ্বৈতবোধ ও তাঁহার ব্যবহারের অসঙ্গতি লক্ষ্য করিয়া লজ্জিত হইলেন। তিনি গুরুজ্ঞানে চণ্ডালের চরণে প্রণত হইলে সে রজত-

গিরিনিভ শ্বেতকায় সদাশিবের রূপ ধারণ করিল। শঙ্করের দৃষ্টি শিবের দিকে পতিত হইবামাত্র তিনি জগৎ শিবময় দেখিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন, জগতের সবই চৈতন্যময়, জড় আর কিছুই নাই; যেমন কুণ্ডল বলয় প্রভৃতি এক স্বর্ণের দ্বারা নির্ম্মিত হয় তেমনি এক চৈতন্যের দ্বারা জগতের সব বস্তুই নির্ম্মিত; চারি-দিগের মন্দির সমূহ জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে, কাঠ পাথর, বৃক্ষ লতা, এমন কি ধূলিকণা পর্য্যন্ত আজ জ্ঞানময় হই-য়াছে; ঊর্দ্ধে আকাশ জুড়িয়া জ্ঞান ও চৈতন্য নিশ্ছিদ্র হইয়া রহিয়াছে, যে দিকে দৃষ্টি পড়ে সবই এক, নিজের দেহ মন বুদ্ধি এক চৈতন্যে গঠিত; একটু মাত্র অহ-ঙ্কারের আভাস থাকায় নানা বস্তুর আকার দেখাইতেছে, এই আমিটুকু এক নিমেষে লোপ হইয়া সব অনুভবের নির্ব্বাণ এখনই হইতে পারে। নির্গুণ নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মকে আবার এক নূতন রূপে প্রত্যক্ষ করিয়া শঙ্কর আনন্দে আত্মহারা হইলেন। অনুভবের একটু বিরাম হইলে মহা-দেব শঙ্করকে আশীর্ব্বাদ করিয়া ভাষ্য লিখিতে প্রবৃত্ত হইবার জন্য আদেশ দিয়া অন্তর্ধ্যান হইলেন।

এখন শঙ্করের এক অদ্ভুত অবস্থা হইল। কখন নির্ব্বিকল্প সমাধিতে একেবারে বাহ্যজ্ঞানশূন্য জড়বস্তুর মত হইয়া যান, কখন বালকের মত "মা" "মা" বলিয়া

ভক্তিতে বিহ্বল হইয়া থাকেন, কখন বা সর্ব্বত্র এক ব্রহ্ম বোধ করিয়া শুচি অশুচি বিচার ভুলিয়া যান, কখন কখন আমি বোধ লোপ হওয়াতে, পাগলের মত উদ্দেশ্যহীন কার্য্যে রত হন। গুরুভ্রাতাগণ অতি যত্নে, অতি সাবধানে তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন।

কয়েকদিন পরে এই সব অনুভবের একটু বিরাম হইতে লাগিল এবং তাঁহার একটু একটু আমি বোধ আসিল। সেই আমি সর্ব্বদাই সমাধি-সাগরে ডুবিতে ভাসিতে লাগিল। তাহাকেই বিদ্যার আমি বলে। সেই 'আমি'তে দয়া ব্যতীত আর কোনও বৃত্তি থাকে না। সেই ঈশ্বরপ্রেরিত দয়াবৃত্তির বশে শঙ্কর কার্য্যে রত হইলেন। কিন্তু তাঁহার কোনও কার্য্যে অনুরাগ বা বিরাগ বোধ হইল না, বাসনার লেশমাত্র উদয় হইল না। তিনি তখন স্বার্থবোধহীন ভগবানের হাতের পুতুল-মাত্র হইয়া পড়িলেন।

শঙ্করের উপদেশ শুনিবার জন্য দলে দলে লোক আসিতে লাগিল। তিনিও গুরুভ্রাতা ও আগন্তুক-গণকে অবিরাম শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অনেকে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল। চিৎসুখ, আনন্দগিরি প্রভৃতি সংসারবিরক্ত যোগিগণ আসিয়া জুটিতে লাগি-লেন। একদিন অতি প্রিয়দর্শন এক ব্রাহ্মণ বালক

আসিয়া শঙ্করের চরণে পতিত হইল। বালকের বিনয় ব্যবহার ও অপূর্ব্ব মুখকান্তি অন্তরের নির্ম্মলভাব প্রকাশ করিতেছি তাহার নাম সনন্দন মহীশূরের দক্ষিণাংশে কাবেরী তটে চোল প্রদেশে তাহার জন্ম হয় সে শিশুকাল হইতে ভগবান লাভের জন্য ব্যাকুল। এক পর্ব্বতে সে বহুকাল একাকী থাকিয়া নৃসিংহদেবের আরাধনা করে। এক মহাপুরুষের কৃপায় তাহার ইষ্টলাভ হয়। নৃসিংহদেব তাহাকে এই বর দেন যে, সে যখন স্মরণ করিবে তখনই তাঁহার দেখা পাইবে। কিন্তু ইহাতে তাহার শান্তি হইল না। মন, বাসনা কামনায় চঞ্চল হইয়া তাহাকে পীড়িত করিতে লাগিল। নৃসিংহদেবের নিকট মনোবেদনা জানাইলে তিনি আদেশ করিলেন, "মানবকে শান্তি দিবার জন্য মহাদেব স্বয়ং ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তুমি তাহার আশ্রয় গ্রহণ কর।" তাই সনন্দন ব্যাকুল হইয়া খুঁজিতে খুঁজিতে শত শত ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া কাশীতে আসিয়াছে। শঙ্কর তাহাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিলে সে কায়মনোবাক্যে গুরুসেবা, শাস্ত্রপাঠ ও সাধনায় রত হইল।

শঙ্করের নিকট শুধু যে জিজ্ঞাসু ভক্তই আসিতেন তাহা নহে; শাস্ত্র বিচার করিতে—পণ্ডিতগণ, মতামত লইয়া তর্ক বিচার করিতে নানা সম্প্রদায়ের লোকও

আসিতেন। দ্বাদশ বৎসর বয়স্ক বালকের অসাধারণ পাণ্ডিত্য বাগ্মিতা ও অসীম জ্ঞান দর্শনে সকলেই স্তম্ভিত হইতেন। বালক তর্কে অজেয়, শাস্ত্র ব্যাখ্যায় সরস্বতী ও জ্ঞান-গাম্ভীর্য্যে সাক্ষাৎ সদাশিব। তাঁহাকে মানুষ বলিয়া ধারণা হইত না। তাঁহার বদনমণ্ডলে কি স্বর্গীয় বিভা, তাঁহার শিশুকণ্ঠের মধুরস্বরে কি মাধুর্য্য ও গাম্ভীর্য্যের সমাবেশ, তাঁহার প্রতি অঙ্গভঙ্গী ও চালচলনে সিংহসম তেজস্বিতার সহিত বালক-সুলভ লালিত্যের সংমিশ্রন ! প্রথম দর্শনেই গৌরকান্তি বালকের মুখশ্রী সকলের হৃদয়ে স্নেহ-রসের উদ্রেক করিত, তারপর তাঁহার অশেষ গুণাবলী প্রাণ-মন মোহিত করিয়া ফেলিত।

ভাষ্য রচনা

গুরুর এবং মহাদেবের আদেশ অনুসারে শঙ্কর ভাষ্য লিখিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু কাশীতে এত লোক-সমাগমের মধ্যে ভাষ্য লেখা অসম্ভব, তাই নিভৃতে শাস্ত্র চিন্তা ও গ্রন্থ লিখিবার জন্য তিনি শিষ্যগণসহ বদরিকাশ্রম চলিয়া গেলেন। সেখানে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য ত লিখিলেনই, তাহা ছাড়া গীতা ও দশখানি উপনিষদেরও ভাষ্য লিখিয়া তৎসমুদয় শিষ্যদিগকে শিক্ষা দিলেন। এই সব কার্য্যে তাঁহার প্রায় চারি বৎসর কাটিয়া গেল।

পদ্মপাদ

শিষ্যদিগের মধ্যে সনন্দন সর্ব্বাপেক্ষা বেশী বুদ্ধিমান্ ও গুরুসেবায় তৎপর ছিল, ক্ষণকালের জন্যও গুরুর সঙ্গ ত্যাগ করিত না। তাহার ফলে গুরুও তাহাকে অনুগ্রহ করিতেন; তাই ভাষ্যগুলি সে অন্যাপেক্ষা বেশী পাঠ করিবার ও তাহার মর্ম্ম ভালরূপে বুঝিয়া লইবার সুযোগ পাইয়াছিল। এই সব কারণে তাহার গুরুভ্রাতাগণ তাহাকে ঈর্ষ্যা করিতে লাগিলেন। শঙ্কর তাহা বুঝিতে পারিয়া কৌশলে তাঁহাদের এই ভ্রম দূর করিলেন।

একদিন কার্য্য উপলক্ষে সনন্দন গঙ্গার অপর পারে গিয়াছে, এমন সময় শঙ্কর তাহাকে নাম ধরিয়া আহ্বান করিতে লাগিলেন। গুরুর কণ্ঠস্বরে সনন্দন এমনই তন্ময় হইয়া গেল যে, সম্মুখস্থ ভাগীরথীর কথা ভুলিয়া গিয়া সোজাসোজী গুরুর দিকে ছুটিয়া আসিতে লাগিল। গুরুর উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান শুনিয়া উপস্থিত শিষ্য সকলের দৃষ্টি সনন্দনের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল। তাঁহারা দেখিলেন, সনন্দনের প্রতি পদ-বিক্ষেপ-স্থলে নদীগর্ভ হইতে এক একটি পদ্ম ফুটিয়া উঠিয়া তাহার পদস্থাপনের স্থান করিয়া দিতেছে। সনন্দন তন্ময়ভাবে গুরুর চরণ

সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইল। ঈর্ষ্যান্বিত শিষ্যগণ ইহা দেখিয়া সন্দনের প্রভাব বুঝিতে পারিয়া অন্তরে লজ্জিত হইলেন। শঙ্কর তদবধি তাহাকে পদ্মপাদ নামে অভিহিত করিলেন।

গুরুর আদেশ কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। শঙ্করের আয়ুও নিঃশেষ প্রায়। যতদিন শুষ্কপত্রের ন্যায় দেহ খসিয়া না পড়ে, ততদিন ধর্ম্মপ্রচার করিয়া শিব-ক্ষেত্র বারাণসীধামে ব্রহ্মনির্ব্বাণলাভ করিবার জন্য তিনি বদরিকাশ্রম ত্যাগ করিলেন। শঙ্কর কাশীতে আসিয়াছেন সংবাদ পাইয়া আবার লোকে ভিড় করিতে লাগিল। আবার তর্ক, বেদান্ত-ব্যাখ্যা, পরাজয়, শিষ্যত্ব-গ্রহণ দ্বিগুণ ভাবে চলিল।

বেদব্যাসের আদেশ

একদিন এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আসিয়া ব্রহ্মসূত্রের একটি সূত্রের অর্থ সম্বন্ধে তর্ক করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধকে শঙ্করের ন্যায়ই মহাজ্ঞানী বলিয়া বোধ হইল। শিশু ও বৃদ্ধের তর্ক ক্রমেই জমিয়া উঠিতে লাগিল। উভয়েরই বেদ বেদান্ত কণ্ঠস্থ, উভয়ের বুদ্ধিই কুশাগ্রের ন্যায় সূক্ষ্ম! তাঁহারা এমনই মাতিয়া গেলেন যে, নিত্যকর্ম্মের সময় ব্যতীত অনবরত আট দিন ধরিয়া তর্কের স্রোত বহিয়া

যাইতে লাগিল। পণ্ডিতগণ সেই অপূর্ব্ব তর্কযুদ্ধ দেখিবার জন্য আগ্রহান্বিত চিত্তে স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন। ক্রমে তর্ক এমন সূক্ষ্ম বিষয়ে উপস্থিত হইল যে, পণ্ডিতগণের পক্ষেও তাহা দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠিল।

পদ্মপাদের মনে এক ঘোর সন্দেহ জন্মিল যে, সামান্য মানুষের পক্ষে এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ন্যায় বিদ্যাবুদ্ধি সম্ভব নহে। এই বৃদ্ধ বয়সেও ইঁহার শাস্ত্র চর্চ্চায় প্রবল উৎসাহ ও প্রখর স্মৃতিশক্তির বিন্দুমাত্র হ্রাস হয় নাই। তাঁহার যুক্তিগুলি শাণিত ও অকাট্য এবং কথায় কথায় কবিত্ব। সমস্ত জীবনই যেন তিনি বেদান্ত চর্চ্চা ও কাব্য রচনায় নিযুক্ত থাকিয়া এই সব বিষয়ে অসীম অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। ইনি ব্যাসদেব ছাড়া আর কে হইতে পারেন? ইঁহার চাল-চলনে শঙ্করের মনেও এইরূপ সন্দেহ জন্মিয়াছিল। পদ্মপাদ তাঁহার নিকট মনোভাব প্রকাশ করিলে তাঁহার সন্দেহ দৃঢ় হইল। অষ্টম দিবসে শঙ্কর বিনীত ভাবে ব্রাহ্মণের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্যাসদেব আর আত্মগোপন করিতে পারিলেন না। আচার্য্যদেব অতি আনন্দের সহিত তাঁহার স্তুতি করিতে লাগিলেন। ব্যাসদেবও স্নেহরসে অভিষিক্ত হইয়া শঙ্করকে বহু আশীর্ব্বাদ করিলেন। তিনি শঙ্কর লিখিত ভাষ্য সমূহ পাঠ করিয়া অতীব আনন্দিত হইলেন এবং বেদের

মর্ম্ম অতি মনোহর ও স্পষ্টরূপেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে বলিয়া ভাষ্যের বহুল প্রশংসা করিলেন।

শঙ্করের জীবনের কার্য্য সমাপ্ত ও আয়ু নিঃশেষ হইয়াছে। আজ সৌভাগ্য বশতঃ ব্যাসদেব ঘটনা ক্রমে উপস্থিত। শঙ্কর তাঁহার সমক্ষে মহাসমাধি অবলম্বন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। শিষ্যগণ গুরুর অল্পায়ুর কথা যে জানিতেন না, তাহা নহে; তবু আজ এমন আনন্দের মধ্যে, এই নিদারুণ কথা শুনিয়া, তাঁহারা সকলেই, শোকার্ত্ত হইয়া, অসহায় ভাবে, সজল নয়নে, ব্যাসদেবের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ত্রিকালজ্ঞ ব্যাসদেব প্রসন্নভাবে বলিতে লাগিলেন, "বৎস শঙ্কর, তুমি বেদের মর্ম্মার্থ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া শিষ্যদিগকে শিক্ষা দিয়াছ সত্য; কিন্তু ইহাতেই কি বেদ উদ্ধার হইয়াছে? যদি তুমি ইহা প্রচার না কর, তাহা হইলে তোমার মত, অন্যান্য মতের ন্যায়, এক সাম্প্রদায়িক মতবাদ মাত্র বলিয়া গণ্য হইয়া রহিবে। ভারতে কত শত ধর্ম্মমত উদ্ভূত হইয়াছে। আমার ব্রহ্মসূত্রের কত অপব্যাখ্যা, কত কদর্থপূর্ণ ভাষ্য হইয়াছে। বেদের মত বলিয়া কত অসদাচার সরল মানুষের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে। তুমি স্বয়ং ঐ সব মতবাদীদের সঙ্গে বিচার করিয়া তাহাদিগকে পরাস্ত করতঃ অদ্বৈতবাদ যে সর্ব্বোৎ-

কৃষ্ট ও ঋষিসম্মত তাহা সুপ্রমাণিত না করিলে তোমার ভাষ্য নিষ্ফল হইবে।

"কুমারিলের প্রাণপণ যত্নে নাস্তিক বৌদ্ধগণ কিয়ৎ-পরিমাণে নিরস্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও তাহাদের সংখ্যা সামান্য নহে। বিশেষতঃ তাহাদের মতের প্রভাব এখনও প্রবল রহিয়াছে। কুমারিল কেবল মাত্র বেদের কর্ম্মকাণ্ড প্রচার করিয়াছেন। জ্ঞানকাণ্ড ভালরূপে প্রচারিত না হইলে, কর্ম্মকাণ্ড হইতে জ্ঞানকাণ্ডের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ না করিলে এই ভীষণ ধর্ম্মগ্লানি দূর হইবে না। এইজন্য তোমাকে সর্ব্বাগ্রে কুমারিল ভট্টকে পরাস্ত করিতে হইবে।

"যদি বল, তোমার ধীমান্ শিষ্যগণ বিরুদ্ধবাদীদিগকে তর্কে পরাস্ত করিয়া অদ্বৈতমত প্রচার করিতে সমর্থ, তবে তর্কে পরাজয় করাতেই কি ধর্ম্ম প্রচার হয়? অদ্বৈতবাদ কি কেবল তর্কের দ্বারা প্রচার করা যায় এবং উৎকৃষ্ট মত রূপে তাহা কেবল স্বীকৃত হইলেই কি ধর্ম্মরক্ষা হয়? অদ্বৈততত্ত্ব অনুভব করাইবার যে মহাশক্তি তোমার মধ্যে প্রকাশিত, তুমি সর্ব্বসাধারণে তাহা বিতরণ না করিলে মানুষ অদ্বৈত মত বুঝিবেই বা কিরূপে আর তাহা বুঝাইয়াই বা কি উপকার হইবে?

"অতএব তুমি ব্রহ্মবিদ্যা প্রচার ও প্রদানের জন্য

আর কিছুকাল মানবদেহে বর্ত্তমান থাক। আমি আশী-র্ব্বাদ করি, আরও ষোল বৎসর তোমার আয়ু বর্দ্ধিত হউক এবং তুমি সর্ব্বত্র বিজয়ী হও।”

শঙ্করের অহংজ্ঞান মাত্র ছিল না, তাই নিজের কোনও প্রবৃত্তি বা অপ্রবৃত্তিও ছিল না। যেমন স্থিরচিত্তে তিনি দেহত্যাগ করিতে চাহিয়াছিলেন, ভগবান বেদব্যাসের আদেশও তেমনই স্থিরচিত্তে গ্রহণ করিলেন। ব্যাসদেব আশীর্ব্বাদ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। শিষ্যগণ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া আচার্য্যদেবের বিজয়লীলা দেখিবার জন্য সমুৎসুখ হইয়া উঠিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়

মণ্ডন-বিজয়

আচার্য্য শঙ্কর কুমারিলের সহিত বিচার করিবার জন্য সশিষ্য প্রয়াগধামে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে পৌঁছিয়া জানিতে পারিলেন ভট্টপাদ কুমারিল গুরুহত্যা পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য তুষানলে প্রাণ বিসর্জ্জন করিবার সংকল্প করিয়াছেন। আচার্য্যদেব ত্বরিতপদে ভট্টপাদের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তিনি স্থিরভাবে এক জ্বলন্ত তুষের স্তূপে বসিয়া আছেন; তাঁহার দেহ জ্বলিয়া যাইতেছে, প্রভাকরাদি শিষ্যগণ এই ভীষণ দৃশ্য দেখিয়া অশ্রুমোচন করিতেছেন।

শঙ্করের পরিচয় পাইয়া ভট্টপাদ আনন্দিত হইলেন। তিনি শঙ্করের বিষয় সবিশেষ শুনিয়াছিলেন, এমন কি তাঁহার ভাষ্যও পাঠ করিয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস হইয়াছিল এই ভাষ্য প্রচার হইলে দুষ্টমত সকল নিরস্ত হইবে এবং বেদের মহিমা পূর্ণ গৌরবে পুনরুদ্ভাসিত হইবে। শঙ্কর তাঁহার সহিত বিচারের অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। কিন্তু কুমারিল তাঁহার প্রায়শ্চিত্তের সংকল্প ভঙ্গ করিতে

সম্মত হইলেন না। তিনি শঙ্করকে বলিলেন যে, তাঁহার শিষ্য মণ্ডনমিশ্র তাঁহা অপেক্ষাও অধিক ধীমান! তাঁহাকে পরাস্ত করিলেই কুমারিলকে পরাস্ত করা হইবে। তখন শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাঁহাদের তর্কে মধ্যস্থ হইতে পারে এমন লোক কোথায় পাওয়া যাইতে পারে?"

কুমারিল বলিলেন, "মণ্ডনের পত্নী উভয়ভারতী সাক্ষাৎ সরস্বতীতুল্যা, তাঁহাকে মধ্যস্থ মানিলেই চলিবে।"

কুমারিলের নির্দ্দেশমত আচার্য্যদেব মণ্ডনের সঙ্গে বিচার করিতে মাহিষ্মতী নগরে উপস্থিত হইলেন। মণ্ডনের গৃহে এত বেদবিদ্যার চর্চ্চা হইত যে, দাসদাসী পর্য্যন্ত সেই সব বিষয় লইয়া আলোচনা করিত। এমন কি গৃহপালিত শুকপক্ষী পর্য্যন্ত বেদবাক্য আবৃত্তি করিত। মণ্ডনের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া আচার্য্য দেখিলেন, দ্বার রুদ্ধ, জিজ্ঞাসায় জানিলেন মণ্ডন পিতৃশ্রাদ্ধের আয়োজনে ব্যস্ত। শুভকার্য্যে অমঙ্গলজনক কিছু দেখিবার ভয়ে তিনি দ্বার রুদ্ধ করিয়াছিলেন। সন্ন্যাসীকেও তিনি অশুভ-দর্শন মনে করিতেন, কারণ সন্ন্যাসী নিজের শ্রাদ্ধ করিয়া মৃতবৎ হইয়া যান, সুতরাং সন্ন্যাসীর দেহ শববৎ অমঙ্গলসূচক।

শঙ্কর যোগশক্তিবলে শূন্যপথে একেবারে মণ্ডনের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলেন। রুদ্ধ-দ্বার-গৃহ। সহসা

অসম্ভাবিতরূপে এই প্রকার সন্ন্যাসীর আবির্ভাব দেখিয়া মণ্ডন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। তখন উভয়ের মধ্যে যে কথা-বার্ত্তা হয় তাহা বড়ই আমোদজনক।

মণ্ডন—কোথা হইতে মুণ্ডি? (হে মুণ্ডিত-শির সন্ন্যাসী, কোথা হইতে আসিলে?)

শঙ্কর—গলা হইতে। (আমি গলা হইতে মাথা পর্য্যন্ত মুড়াইয়া মুণ্ডী হইয়াছি।)

ম—তা বই কি, শিখা সূত্রের ভার সহিল না, গাধার মত কন্থা বহন করিতেছ।

শ—রমণী-পোষণ-ভারবাহী-গর্দ্দভদের ভারলাঘব করিবার জন্যই আমি কন্থা বহন করিতেছি। 'বৈরাগ্য হওয়া মাত্র সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে,' 'শিখাসূত্র ত্যাগ করিবে,' 'অন্য আশ্রম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস-পূর্ব্বক আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিবে,'—ইহাই বেদের মত।

ম—পত্নী-রক্ষণে অসমর্থ হইয়া গৃহত্যাগ করিয়াছিলে। এখন শিষ্য ও পুস্তকের ভার বহন করিয়া খুবই ব্রহ্মনিষ্ঠা দেখাইতেছ।

শ—আলস্য বোধে গুরু-শুশ্রূষা ত্যাগ করিয়া নারী-শুশ্রূষা অবলম্বন করায় তোমারও কর্ম্মনিষ্ঠার বেশ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

ম—ধিক্ কৃতঘ্ন, মূর্খ ! নারী-গর্ভে বাস, নারীর যত্নে লালিত পালিত হইয়া বারবার নারী-নিন্দা করিতেছ ?

শ—নারী-গর্ভে বাস ও স্তন্যপান করিয়া তুমি নারীর সঙ্গে পশুবৎ ব্যবহার করিতেছ। তুমি কৃতঘ্ন মূর্খ, না আমি কৃতঘ্ন মূর্খ ?

ম—মূর্খ, দ্বিজাতি হইয়া অগ্নি-উপাসনা পরিত্যাগ করিয়াছ। তুমি ইন্দ্র-হত্যাকারী মহাপাপী।

শ—তুমি আত্মতত্ত্ব পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মকাণ্ডে আয়ু ক্ষয় করিতেছ। তুমি আত্মহত্যাকারী মহাপাপী।

ম—তুমি চোরের মত আমার গৃহে প্রবেশ করিয়াছ। তুমি চোর।

শ—তুমি গৃহস্থ, তোমার অন্নে সন্ন্যাসীর ভাগ আছে। সন্ন্যাসীর ভাগ চুরি করিবার জন্য তুমি দ্বাররুদ্ধ করিয়াছিলে। তুমি চোর।

ম—কোথায় তোমার মত মূর্খ সন্ন্যাসী, আর কোথায় ব্রহ্ম-জ্ঞান ! কোথায় সন্ন্যাস আর কোথায় কলিকাল ! পরের অন্নে রসনা তৃপ্তির জন্য যতি বেশে ঘুরিয়া ফিরিতেছ।

শ—কোথায় স্বর্গ, আর কোথায় তোমার ন্যায় বিষয়াসক্ত লোক ! কোথায় বৈদিক যাগযজ্ঞ, আর কোথায় কলিকাল ! ইন্দ্রিয়সুখের লালসায় গৃহস্থ সাজিয়া তুমি ভণ্ডামি করিতেছ।

মণ্ডন দুইজন মহাপণ্ডিত ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধকার্য্যে পৌরহিত্য করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিলেন। তাঁহারা স্থিরচিত্তে এই তর্ক-বিতর্ক শ্রবণ করিতেছিলেন। তাঁহারা দেখিলেন, মণ্ডন ক্রুদ্ধ হইয়া কথা বলিতেছেন, কিন্তু সন্ন্যাসী প্রশান্তভাবে সরস উত্তর দিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিতেছেন; ইঁহার বাক্য বেদসম্মত যুক্তিপূর্ণ। ইনি সামান্য মানুষ নহেন, এই বিবেচনায় তাঁহারা মণ্ডনকে ক্রোধ পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়া বলিলেন, "ইনি বেদজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয় যতি। আজ শ্রাদ্ধ-বাসরে ইঁহাকে কোথায় সাদর অভ্যর্থনা করিবে, না তুমি ইঁহার প্রতি রূঢ় বাক্য প্রয়োগ করিতেছ। আজ বিনীতভাবে ইঁহাকে নিমন্ত্রণ করাই তোমার কর্ত্তব্য।" পুরোহিতগণের বাক্যে মণ্ডন শান্ত হইলেন এবং অদ্য তাঁহার গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করিবার জন্য যথারীতি শঙ্করকে নিমন্ত্রণ করিলেন। শঙ্কর বলিলেন, "আমি তর্ক-ভিক্ষা করিতে আপনার নিকট উপস্থিত। অন্য ভিক্ষায় আমার প্রয়োজন নাই। 'যে পরাজিত হইবে সে জেতার শিষ্যত্ব ও আশ্রম গ্রহণ করিবে,' এই পণে আমি তর্ক করিতে চাই। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, পরাস্ত হইলে আমি দণ্ড কমণ্ডলু ত্যাগ করিয়া শিখাসূত্র গ্রহণ করতঃ আপনার শিষ্য হইব। আপনি পরাজিত হইলে আমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাসী

হইবেন, এই পণে আমাকে তর্ক ভিক্ষা দিন। অথবা আমার নিকট পরাজয় স্বীকার করতঃ আমার মত গ্রহণ করুন।”

তরুণ-সন্ন্যাসীর ঈদৃশ দম্ভপূর্ণ বাক্য শ্রবণে মণ্ডন প্রথমতঃ একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তিনি ভারত-বিজয়ী কুমারিলের প্রধান শিষ্য। তাঁহার সম্মুখে বেদ-বিদ্যা সম্বন্ধে এইরূপ দম্ভ করিতে পারে এমন লোক আছে বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস ছিল না। বিশেষতঃ এই প্রকার একটি বালক তাঁহাকে তর্ক-যুদ্ধে আহ্বান করিতেছে। বালকের বদনে এমন এক অসামান্য প্রতিভা-দীপ্তি যে, তাহার বাক্য অসার বলিয়া উড়াইয়াও দেওয়া যায় না। বিশেষতঃ মহাজ্ঞানী পুরোহিতদ্বয় ইহাকে বেদজ্ঞ বলিয়া স্বীকার করিলেন। কাজে কাজেই মণ্ডনমিশ্র অতি দম্ভের সহিত শঙ্করের প্রস্তাবানুযায়ী পণে তর্ক করিতে সম্মত হইলেন। তিনি পুরোহিতদ্বয়কে মধ্যস্থ হইতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু তাঁহারা এই প্রস্তাবে সম্মত না হইয়া বলিলেন যে, মণ্ডন-পত্নী উভয়ভারতীই এই কার্য্যের সম্পূর্ণ উপযুক্তা। ভট্টপাদও আচার্য্যদেবকে পূর্ব্বেই উভয়ভারতীর কথা বলিয়া ছিলেন। সুতরাং উভয় পক্ষ উভয়ভারতীকে মধ্যস্থ স্বীকার করিলেন। স্থির হইল, পরদিন প্রাতঃকালে তর্ক আরম্ভ হইবে। মণ্ডনের বিনীত অনুরোধে শঙ্কর তাঁহার গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করিলেন।

উভয়ভারতী উভয়শঙ্কটে পড়িলেন। মণ্ডনের পক্ষে মত দিলে লোকে তাঁহাকে স্বভাবতঃ স্বামী-পক্ষপাতিনী বলিবে; আবার স্বামীর পরাজয়ই বা কিরূপে ব্যক্ত করিবেন? এইরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি এক কৌশল স্থির করিলেন,—তিনি প্রত্যহ দুইগাছি ফুলের মালা উভয়ের কণ্ঠে পরাইয়া দিবেন, যিনি নিজপক্ষের দুর্ব্বলতা অনুভব করিয়া ব্যস্ত, উত্তেজিত হইবেন, তাঁহার শরীরে নিশ্চয়ই তাপবৃদ্ধি হইবে। তাহাতে তাঁহার গলার মালা অগ্রে ম্লান দেখাইবে। এইরূপে অনায়াসে জয় পরাজয় নির্ণীত হইবে।

পরদিন প্রভাতে বিচার আরম্ভ হইল। উভয়ভারতী দুই জনের গলায় দুই গাছি মালা পরাইয়া দিলেন। শঙ্করের মতে—"এক ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় বস্তু নাই, মায়ার ভিতর দিয়া দেখাতে লোকে তাঁহাকে নানারূপে দেখিতে পায়; ব্রহ্মের বিষয় শুনিতে শুনিতে ও ভাবিতে ভাবিতে যখন ভ্রম দূর হইবে, তখন জানিবে—একমাত্র নিশ্ছিদ্র নিরন্তর ব্রহ্মই আছেন, আর কিছুই নাই; এই জ্ঞানে জীবের মুক্তি; ইহাই জীবনের উদ্দেশ্য; সমগ্র বেদের ইহাই মর্ম্ম।"

মণ্ডনের মতে বেদের মর্ম্ম এই যে,—"বৈদিক মন্ত্রের দ্বারা যাগযজ্ঞ করিয়া স্বর্গ প্রাপ্তিতেই জীবের মুক্তি; ইহাই

জীবনের উদ্দেশ্য।” এখন যুক্তি এবং বেদবাক্যের দ্বারা অন্যের মত খণ্ডন করিয়া নিজ মত স্থাপন করিতে হইবে। উভয়েই অদ্ভুত প্রতিজ্ঞাবলে, যেন অখণ্ডনীয় যুক্তি-জালে প্রতিপক্ষের মতকে আবৃত করিলেন, আবার উভয়েই চিন্তাতীত যুক্তিপূর্ণ হেতু প্রদর্শন করিয়া প্রতিপক্ষের যুক্তি-জাল ছিন্ন করিয়া নিজ মতের উৎকর্ষ প্রদর্শন করিলেন। চারিদিক হইতে শত শত পণ্ডিত আসিয়া সেই অপূর্ব্ব তর্ক শ্রবণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে ষোল দিন গত হইল। মণ্ডন দেখিলেন, তাঁহার পক্ষের যুক্তি ক্রমেই নিঃশেষ হইয়া আসিতেছে। সপ্তদশ দিবসে তাঁহার আর বলিবার কিছুই রহিল না। লজ্জায় ক্ষোভে তাঁহার শরীর শীর্ণ, মুখ বিবর্ণ হইল, গলার মালা শুকাইয়া গেল, তিনি দিবা-প্রদীপের ন্যায় নিস্তেজ হইয়া রহিলেন। উভয়-ভারতীও শঙ্করের পক্ষ সমর্থন করিলেন। পণ্ডিতমণ্ডলী এই ষোড়শবর্ষীয় বালকের ধীশক্তির বিষয় ভাবিয়া চমৎকৃত হইলেন এবং মণ্ডনের পরিণাম দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলেন।

পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা অনুসারে এখন মণ্ডনকে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু উভয়-ভারতী এক আপত্তি উত্থাপন করিলেন। তিনি বলিলেন, “স্ত্রী পুরুষের অর্দ্ধাঙ্গ। আপনি আমার স্বামীকে পরাস্ত করিয়াছেন, কিন্তু এখনও

আমাকে পরাস্ত করিতে পারেন নাই। সুতরাং আপনার জয় এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। এখন আমি পূর্ব্বপক্ষ অবলম্বন করিব, আপনি আমার সঙ্গে বিচার করুন।”— এই বলিয়া তিনি কামশাস্ত্র সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করিলেন।

আচার্য্যদেব শিশুকালেই সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। স্ত্রীলোক সম্বন্ধে তাঁহার কোনও জ্ঞানই ছিল না। সন্ন্যাসীর পক্ষে স্ত্রী-চরিত্র সম্বন্ধীয় শাস্ত্র পাঠ, এমন কি সেই বিষয়ে আলোচনাও নিষিদ্ধ। এই অবস্থায় এই সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। আবার, যে মহৎকার্য্যে তিনি নিযুক্ত মণ্ডনমিশ্রের ন্যায় লোকের সহায়তা তাহাতে বিশেষ প্রয়োজন এবং এই কার্য্যের প্রথমেই একটা বিফলতা ঘটিতে দেওয়া সঙ্গত নহে। অতএব কোনও কৌশলে উভয়ভারতীকে নিরস্ত করিতে হইবে। কোনও গৃহস্থের দেহে প্রবিষ্ট হইয়া প্রশ্নগুলির উত্তর লিখিয়া ইঁহাকে প্রদান করিবেন,—এই অভিপ্রায়ে শঙ্কর উভয়ভারতীর নিকট হইতে একমাস সময় লইলেন।

পরকায় প্রবেশ

আচার্য্যদেব যোগশক্তি বলে শূন্যে উঠিয়া কোনও গৃহস্থের মৃতদেহের সন্ধান করিতে করিতে দেখিলেন,

অমরুক নামক রাজা মৃগয়া করিতে গিয়া হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন, আত্মীয়গণ তাঁহার মৃতদেহের চারিপাশে বসিয়া রোদন করিতেছে। আরব্ধ দেব-কার্য্য সাধনের জন্য এই রাজদেহেই প্রবেশ কর্ত্তব্য ভাবিয়া শঙ্কর সত্বর ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি নিজদেহ হইতে বহির্গত হইয়া রাজদেহে প্রবেশ করিলে তাঁহার দেহ কিরূপ সাবধানে ও যত্নে রক্ষা করিতে হইবে সেই বিষয়ে শিষ্যগণকে উপদেশ দিয়া, এক অতি নির্জ্জন প্রদেশে গিরিগুহায় সমাধি অবলম্বন করিলেন। শিষ্যগণ অতি সাবধানে ও প্রাণপণ যত্নে গুরুর দেহ রক্ষায় নিযুক্ত হইলেন।

শঙ্কর প্রবেশ করায় রাজদেহে ধীরে ধীরে জীবনের লক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল। আত্মীয়গণ আশান্বিত হইয়া শুশ্রূষা করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে রাজা নিদ্রা হইতে উত্থিতের ন্যায় নয়ন উন্মীলন করিলেন। রাজা মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাওয়ায় আত্মীয় অমাত্য সৈন্য-সামন্তগণ অতি উল্লাসের সহিত রাজার সঙ্গে রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য রাজা হইয়াছেন। তিনি অতি উৎকৃষ্ট বিধি-বিধান দ্বারা অল্প কয়েক দিবস মধ্যেই রাজ্যের অনেক উন্নতিসাধন করিলেন। রাজার বিচার-শক্তি, পাণ্ডিত্য ও গাম্ভীর্য্য দেখিয়া মন্ত্রিগণ আশ্চর্য্যান্বিত

হইলেন। রাজার আত্মীয়গণ তাঁহার পূর্ব্ব প্রকৃতির অসম্ভব পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলেন। তাঁহাদের বুঝিতে বাকী রহিল না যে, কোনও যোগী পুরুষ কোনও কার্য্য-সিদ্ধির জন্য রাজার দেহে প্রবেশ করিয়াছেন।

মন্ত্রিগণ পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, যোগী যদি পূর্ব্ব দেহ কোথায়ও গোপনে রক্ষা করিয়া থাকেন তবে তাহা সন্ধান করিয়া দগ্ধ করিতে পারিলে তাঁহাকে বহুদিন এই রাজদেহেই থাকিতে হইবে। তাহাতে রাজ্যের মহা উপকার হইবে। কিন্তু রাজার অজ্ঞাতে এই কার্য্য করিতে হইবে। কোনও মৃতদেহ কোথাও রক্ষিত আছে কিনা গোপনে সন্ধান করিতে এবং তাহা পাওয়া মাত্র দগ্ধ করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা অনেক কর্ম্মচারী গোপনে নিযুক্ত করিলেন।

একমাস পূর্ণ হইতে চলিল, এখনও গুরুদেব নিজ দেহে ফিরিতেছেন না দেখিয়া শিষ্যগণ বড়ই ভীত হইলেন। পূর্ব্বকালে এক যোগী এইরূপে এক রাজদেহে প্রবেশ করিয়া ভোগে মত্ত হইয়াছিলেন, অবশেষে এক শিষ্য অতি কষ্টে তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করেন। আবার যেন সেই ঘটনা না ঘটে, এই ভাবিয়া পদ্মপাদ কয়েকজন সুকণ্ঠ গুরুভ্রাতাসহ সংগীত-ব্যবসায়ী সাজিয়া অমরুক রাজের সভায় গেলেন এবং সংস্কৃত ভাষায় বৈরাগ্যপূর্ণ গান গাহিয়া

রাজার পূর্ব্বস্মৃতি জাগরূক করিতে চেষ্টা করিলেন। শঙ্কর শিষ্যগণকে চিনিতে পারিলেন এবং সত্তসমাপ্ত স্ত্রী-চরিত্র সম্বন্ধীয় গ্রন্থখানা পদ্মপাদের হস্তে দিয়া বলিলেন, "আমি আসিতেছি।"

রাজভৃত্যগণ খুঁজিতে খুঁজিতে গুহামধ্যে রক্ষিত শঙ্করের দেহের সন্ধান পাইল। তাহারা শিষ্যগণের নিকট হইতে দেহ কাড়িয়া লইয়া পোড়াইয়া ফেলিবার জন্য চিতা সাজাইয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিল। এই সময় শঙ্কর রাজদেহ পরিত্যাগ করিয়া নিজদেহে প্রবেশ করিলেন। যোগী সহসা নড়িতেছেন দেখিয়া ভৃত্যগণ ভয়ে পলায়ন করিল। শঙ্কর চিতাশয্যা হইতে উঠিয়া আসিয়া শিষ্যগণের সঙ্গে মিলিত হইলেন।

সশিষ্য আচার্য্যদেব মাহিষ্মতী নগরে আসিয়া দেখিলেন, মণ্ডনের বৈরাগ্য উপস্থিত; তিনি ব্রহ্মবিদ্যালাভের জন্য, মুক্তি লাভের জন্য ব্যাকুল। উভয়ভারতী আচার্য্যদেবের গ্রন্থে তাঁহার প্রশ্নের উত্তর পাইয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং স্বামীর সন্ন্যাস নিশ্চিত জানিয়া সমাধি অবলম্বনে দেহ ত্যাগ করিলেন। মণ্ডন সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন, তাঁহার নাম হইল সুরেশ্বর।

পঞ্চম অধ্যায়

দিগ্বিজয়

মণ্ডনের ন্যায় মহাপণ্ডিত এক বালক-সন্ন্যাসীর নিকট পরাজিত, এমন কি তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করতঃ সন্ন্যাসী হইয়া তাঁহার সঙ্গে চলিয়া গিয়াছেন, এই সংবাদ কেবল মাহিষ্মতীনগরে আবদ্ধ রহিল না। শঙ্করও এক নগর হইতে আর এক নগরে গিয়া অদ্বৈতমত প্রচার করিতে লাগিলেন। তিনি নগরে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই তাঁহার সম্বন্ধে নানাপ্রকার সত্য মিথ্যা সংবাদ নগরবাসিগণ শুনিতে থাকিত এবং তাঁহার অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপ দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিত। এই অল্প বয়সে শাস্ত্রজ্ঞান, বাগ্মিতা, বিচারশক্তি এবং সর্ব্বোপরি চরিত্রের মাধুর্য্যে তিনি লোককে আশাতিরিক্ত মোহিত করিতেন। তাঁহার শিষ্য-সংখ্যা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। লোক এমনই আকৃষ্ট হইল যে, তিনি যেখানেই যাইতে লাগিলেন শত শত লোক তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। কোনও স্থানে তিনি উপস্থিত হইলে সে স্থানে যেন মেলা বসিত ও এক আনন্দের হিল্লোল উঠিত। নানামতাবলম্বিগণ তর্কবিতর্ক

করিয়া যখন অদ্বৈতমত গ্রহণ করিত তখন তাহাদের প্রাণে এক অপূর্ব্ব শান্তি আসিত, শঙ্করকে তাহারা প্রাণের দেবতা ভাবিয়া তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করিত।

আচার্য্যদেব প্রচার করিলেন, "সর্ব্ববিধ দুঃখতাপের হাত হইতে চিরমুক্তি লাভই ধর্ম্মের উদ্দেশ্য। অব্যাহত, অচিন্ত্য, জ্ঞান ও পূর্ণ শান্তিস্বরূপ ব্রহ্মের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে মিশিয়া না গেলে দুঃখতাপ দূর হইতে পারে না। শাস্ত্রে বিশেষ অধিকারীর জন্য যে উপাসনা, সাধনা, যাগযজ্ঞ প্রভৃতি ধর্ম্মকার্য্যের নির্দ্দেশ আছে, তাহার উদ্দেশ্য—ঐ পূর্ণশান্তিময় অদ্বৈত অবস্থা লাভ করা। কেহ যদি সাধনা করিয়া কোনও দেবতাকে লাভ করে, তবে তাহাতে তাহার বাসনা কামনা দূর হয় না। তবে অদ্বৈত ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়া বৌদ্ধ, শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি সাধকগণ যদি ঋষিপ্রদর্শিত প্রণালীতে ইষ্টচিন্তা করেন, তবে চরমে তাঁহাদের মুক্তি হয়।

নানাবিধ ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোক তাঁহার সঙ্গে বিচার করিয়া নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিল। তখন তিনি কৃপাদৃষ্টি বা স্পর্শের দ্বারা তাহাদিগকে অদ্বৈত-তত্ত্ব বোধ করিবার শক্তি প্রদান করিলেন। তাহারা তৎক্ষণাৎ তাঁহার মতের যথার্থতা বুঝিতে পারিল। যাহাদের চিত্তশুদ্ধ ছিল, তাহারা শক্তি পাওয়া মাত্র সমাধিস্থ হইয়া

অদ্বৈততত্ত্ব প্রত্যক্ষ অনুভব করিল। জিজ্ঞাসু পিপাসু বহুলোক ধর্ম্মের জন্য ব্যাকুল ছিল; তাহারা তাঁহার পাদস্পর্শে ইষ্ট বস্তুর সন্ধান পাইল। তিনি ধর্ম্ম-ব্যাখ্যা ও বিচারের দ্বারা কুমত কদাচার দূর করিলেন এবং অধ্যাত্মশক্তি প্রদান করিয়া মানুষের মনে সুপ্ত ধর্ম্মভাব জাগ্রত করিতে লাগিলেন।

উগ্রভৈরব

শঙ্কর শ্রীশৈল নামক স্থানে ধর্ম্মপ্রচার করিতে গেলে সকলেই তাঁহার মত গ্রহণ করিল; এমন কি, উগ্রভৈরব নামক জনৈক কাপালিক নিজমত ত্যাগ করিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল। কাপালিকগণ বড় ভয়ানক লোক ছিল। তখনকার দিনে দেশে তাহাদের খুব প্রভাব; লোকের অনিষ্ট করিবার নানারূপ "সিদ্ধাই"-ই তাহার কারণ। তাহাদের দলে লোক সংখ্যাও কম ছিল না। মানুষের মাথার খুলিতে তাহাদের আহার, মদ্যপান সবই চলিত। সন্ন্যাসীর কমণ্ডলুর ন্যায় একখানা 'নরকপাল' সর্ব্বদা ইহাদের সঙ্গে থাকিত বলিয়া তাহাদিগকে লোকে কাপালিক বলিত।

কাপালিক সেবাশুশ্রূষা করিয়া সর্ব্বদা আচার্যদেবের নিকট থাকিবার সুবিধা করিয়া লইল। একদিন তাঁহাকে একাকী পাইয়া সে বলিল, "আমি অলৌকিক শক্তি

লাভের জন্য বহুদিন ভৈরবের আরাধনা করিয়াছিলাম, কিন্তু কোনও যোগী বা রাজার দেহ বলি দিতে না পারায় ভৈরবকে প্রসন্ন করিতে পারি নাই। সেই সিদ্ধি লাভের জন্য আমার মন সতত ব্যাকুল। অদ্বৈত মত খুব উৎকৃষ্ট বটে কিন্তু আমি কিছুতেই সিদ্ধির কথা ভুলিতে পারিতেছি না। আপনি মহাযোগী, এই জগতে আপনার কিছুরই প্রয়োজন নাই, আপনি ব্রহ্মজ্ঞানে পূর্ণকাম হইয়াছেন। যদি শিষ্যের মঙ্গলের জন্য আপনার নিষ্পাপ দেহটি বলি প্রদান করেন, তবে আমার মহা উপকার হয়। দধিচী ইন্দ্রের স্বর্গরাজ্য লাভের জন্য দেহপ্রদান করিয়া অক্ষয়-কীর্ত্তি রাখিয়াছেন; শিষ্যের মহাশক্তি লাভের জন্য দেহ দিলে আপনারও সেইরূপ অক্ষয়কীর্ত্তি লাভ হইবে।"

শঙ্করের কোনও স্বার্থ-বুদ্ধিই ছিল না। তিনি ভগবানের যন্ত্রস্বরূপ কার্য্য করিয়া যাইতেন। তাঁহার মন সর্ব্বদা ব্রহ্মভাবে তন্ময় হইয়া থাকিত। অন্য কোনও বিষয়ে ভাবনা চিন্তা না করায় তাঁহার স্বভাব ঠিক শিশুর ন্যায় ছিল; যে যাহা বলিত তাহাই বিশ্বাস করিতেন। ভগবানের প্রেরণায় দেহমন ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যে রত হইত; ইহাতে তাঁহার নিজের কোনও কর্ত্তৃত্ব ও সংকল্প ছিল না। কাপালিকের প্রস্তাবে তিনি কোনও আপত্তির কারণ দেখিলেন না। তবে শিষ্যগণ হয়ত এই প্রস্তাবে সম্মত

হইবে না। তখন উভয়ে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, নিকটবর্ত্তী কোনও নিবিড় অরণ্যে ভৈরব-পূজার আয়োজন করিয়া নির্দ্দিষ্ট দিনে তাঁহাকে ইঙ্গিত করিলে তিনি গোপনে তথায় গিয়া শিষ্যের অভিলাষ পূর্ণ করিবেন।

পরবর্ত্তী অমাবস্যা রাত্রে নিকটবর্ত্তী কোনও অরণ্যে কাপালিক ভৈরব-পূজার আয়োজন করিল। মধ্যরাত্রে শিষ্যগণ সকলে নিজ নিজ আসনে নিদ্রিত হইলে শঙ্কর ধীরে ধীরে উঠিয়া কাপালিকের ইঙ্গিত অনুসারে পূজা স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। কাপালিক মহানন্দে ভৈরবপূজা ও বলি সম্বন্ধীয় ক্রিয়ায় রত হইল। শঙ্করের কাছে এই জগৎ তুচ্ছ, দেহ একটা ভ্রম মাত্র; সমাধিতে আনন্দ-সাগরে মন লীন হইয়া গেলে দেহের স্মৃতি পর্য্যন্ত থাকে না। তিনি সত্বর অভীষ্ট কার্য্য সমাধা করিতে কাপালিককে আদেশ দিয়া যোগাসনে উপবিষ্ট হইলেন।

পদ্মপাদ গুরুর নিকটে নিজ আসনে নিদ্রিত ছিলেন। তিনি স্বপ্নে দেখিলেন, এক কাপালিক গুরুকে হত্যা করিতেছে। অমনি জাগরিত হইয়া আসনে গুরুদেবকে দেখিতে না পাইয়া অধীরভাবে গুরুভ্রাতাদিগকে জানাইলেন। তাঁহারা সকলে ছুটাছুটি করিয়া চারিদিকে সন্ধান করিয়া গুরুদেবকে দেখিতে পাইলেন না। পদ্মপাদ আতঙ্কে ব্যাকুল হইয়া নৃসিংহদেবকে স্মরণ করিলে তিনি

পদ্মপাদের দেহে আবির্ভূত হইলেন। পদ্মপাদের অবয়ব ভীষণ-দর্শন হইয়া উঠিল। তিনি গর্জ্জন করিতে করিতে কাপালিকের পূজা-স্থানের দিকে ধাবিত হইলেন। শিষ্যগণ কি এক অজ্ঞাত বিপৎপাতের সম্ভাবনায় পদ্মপাদের পশ্চাতে ছুটিতে লাগিলেন। পদ্মপাদ সকলকে পশ্চাতে ফেলিয়া ক্ষণকাল মধ্যে পূজাস্থানে উপস্থিত হইলেন। তখন কাপালিক সিন্দুর-লিপ্ত খড়গহস্তে সমাধিস্থ ভগবান শঙ্করের মস্তক ছেদন করিতে উদ্যত। পদ্মপাদের ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া সে শিহরিয়া উঠিয়া খড়গ তুলিল, কিন্তু চক্ষের নিমিষে পদ্মপাদ খড়গ কাড়িয়া লইয়া তাহারই শিরশ্ছেদ করিলেন এবং ভীষণ গর্জ্জনে বনস্থল কাঁপাইয়া তুলিলেন। শিষ্যগণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িয়া গিয়া এই দৃশ্যে কেহ ভয়ে মূর্চ্ছিত হইলেন, কেহ বা কাঁপিতে লাগিলেন, কেহ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। গোলমালে শঙ্করের সমাধি ভঙ্গ হইল। তিনি পদ্মপাদের দেহে নৃসিংহদেবকে আবির্ভূত দেখিয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। নৃসিংহদেব প্রসন্ন হইয়া পদ্মপাদের দেহ ত্যাগ করিলেন। তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। গুরুভ্রাতাদের শুশ্রূষায় তাঁহার চৈতন্য হইল। দয়াময় আচার্য্যদেব কাপালিক-বধে বড়ই ব্যথিত হইয়া পদ্মপাদকে অনুযোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু পদ্মপাদ তাহাতে বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া বলিতে

লাগিলেন, "গুরুহত্যায় উদ্যত ব্যক্তিকে বধ করিয়া আমি শতবার নরকে যাইতে প্রস্তুত আছি। আপনার দেহের দ্বারা জগতের সহস্র সহস্র লোকের পরমকল্যাণ সম্ভব। এই দেহ রক্ষার জন্য আমার একজন্মের নরক ভোগ ত সামান্য কথা।" পদ্মপাদের এই প্রকার ভক্তিপূর্ণ বাক্যে এবং তাঁহার দৈবশক্তিতে সকলের মনে অসীম শ্রদ্ধার উদ্রেক হইল। আজ এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাওয়ায় তাঁহাদের কত আনন্দ! যাঁহারা পূর্ব্বে পদ্মপাদের প্রতি ঈর্ষান্বিত ছিলেন আজিকার ঘটনায় তাঁহারা অন্তরে অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন।

হস্তামলক

শ্রীবেলীনামক স্থানে প্রায় দুই সহস্র ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহারা নিষ্ঠার সহিত যাগযজ্ঞে রত ছিলেন এবং বেদাদি শাস্ত্র আলোচনায় জীবন যাপন করিতেন। বহুশাস্ত্রজ্ঞ ও যাগযজ্ঞ-পরায়ণ প্রভাকর নামে জনৈক ব্রাহ্মণ তথায় বাস করিতেন। ধনধান্যের অভাব ছিল না কিন্তু তাঁহার একমাত্র ছেলে মূক ও বধির। ছেলেটির বয়স তের বৎস। সে দেখিতে খুব সুশ্রী তাহার মুখমণ্ডল জ্যোতির্ম্ময়, কিন্তু তাহার জ্ঞানবুদ্ধির কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। ক্ষুধাতৃষ্ণা, ঘৃণালজ্জা, দ্বেষহিংসা, এমন কি শীতগ্রীষ্ম বোধ তাহার আছে কিনা বুঝা যাইত না। খাইতে

দিলে কখন খায়, কখন খায় না। সমবয়স্ক ছেলেরা কত অত্যাচার করে, তাহাতে সে কোনও সাড়া দেয় না। মুখ সর্ব্বদা প্রসন্ন, দেখিলে 'হাবা' বলিয়া মনে হয় না। ব্রাহ্মণ ভাবিলেন, হয় ত কোন উপদেবতার 'ভর' ইহার উপর আছে। তাই তিনি কত তন্ত্রমন্ত্র, যাগযজ্ঞ, ঝাড়ফুঁক্ করিলেন, কিছুতেই ছেলের স্বভাবের উনিশ-বিশ হইল না।

শঙ্কর সেখানে ধর্ম্মপ্রচারের জন্য উপস্থিত হইলে প্রভাকর তাঁহার পুত্রকে লইয়া শঙ্করের নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি পুত্রকে শঙ্করের চরণে প্রণাম করাইলেন। বালক চরণে পড়িয়া রহিল দেখিয়া শঙ্কর স্বয়ং হস্তদ্বারা তাহাকে তুলিলেন। ব্রাহ্মণ তখন পুত্রের অবস্থা তাঁহাকে জানাইয়া তাহাকে সুস্থ করিয়া দিবার জন্য মিনতি করিতে লাগিলেন। শঙ্কর বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বালক তুমি কে এবং কেনই বা এরূপ অবস্থায় আছ?" আশ্চর্য্যের বিষয় বালক মধুরকণ্ঠে সংস্কৃত শ্লোকে, অতি জ্ঞানপূর্ণ ভাষায় এমন ভাবে আত্ম-পরিচয় দিল যে, সকলেই তাহাকে ব্রহ্মজ্ঞানী বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। শঙ্কর ব্রাহ্মণকে বলিলেন, "এ ছেলেটি পূর্ব্ব সংস্কার-গুণে ব্রহ্মজ্ঞানী; নতুবা যে কখনও অধ্যয়ন করে নাই, সে আজ এমন ভাবে এই সব

অপূর্ব্ব শ্লোক আবৃত্তি করিল কিরূপে? ইহার সংসারে আসক্তি নাই, দেহে আপন বোধ নাই। ইহাকে লইয়া তুমি কি করিবে? ছেলেটি আমাকে দাও।” ব্রাহ্মণ দেখিলেন, ‘ঠিক কথা ছেলেটি আমার নিকট থাকিয়া সুখী হইতে পারিতেছে না; আমিও তাহাকে লইয়া সুখী নই। এই মহাত্মার নিকট থাকিলে ছেলে ভালই থাকিবে।’ এই ভাবিয়া তিনি ছেলেটি শঙ্করকে প্রদান করিলেন। ব্রহ্মজ্ঞান হস্তস্থিত আমলকী ফলের ন্যায় ইহার সম্পূর্ণ প্রত্যক্ষ হইয়াছে বলিয়া ইহাকে শঙ্কর ‘হস্তামলক’ নামে অভিহিত করিলেন।

একদিন নানাপ্রসঙ্গ উপলক্ষে আচার্য্যদেব হস্তামলকের পূর্ব্ব বিবরণ শিষ্যদের নিকট বলিলেন। একদা প্রভাকরের পত্নী দুই বৎসর বয়স্ক একটি পুত্রকে সঙ্গে লইয়া যমুনাতে স্নান করিতে গিয়াছিলেন। যমুনাতীরে এক যোগী বাস করিতেন। ব্রাহ্মণী তাহার শিশুপুত্রকে সেই সাধুর নিকটে বসাইয়া নদীতে স্নানার্থ গমন করেন। কিয়ৎক্ষণ পরে যোগী একটু অন্যমনস্ক হইলেন, আর বালকটি খেলা করিতে করিতে জলে পড়িয়া গেল। তৎক্ষণাৎ তাহাকে জল হইতে তুলা হইল কিন্তু শিশু আর বাঁচিল না। ব্রাহ্মণী বড়ই আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। যোগীর

হৃদয় করুণায় গলিয়া গেল ; তাঁহারই অসাবধানতায় ব্রাহ্মণী পুত্রহীনা হইলেন। তিনি যোগবলে নিজদেহ পরিত্যাগ করিয়া সেই দুই বৎসরের শিশুর দেহে প্রবেশ করিলেন। ব্রাহ্মণী পুত্র লইয়া গৃহে ফিরিলেন কিন্তু লজ্জায় ও ভয়ে এই ঘটনা কাহারও নিকট প্রকাশ করিলেন না। যোগীও যাহাতে সংসার-বন্ধনে না পড়েন সেই জন্য, বহির্জগৎ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য অবলম্বন করিয়া রহিলেন।

তোটকাচার্য্য

তুঙ্গভদ্রাতীরে শৃঙ্গগিরি নামে একটি অতি পবিত্র স্থান আছে। সেখানে অতি প্রাচীনকালে ঋষ্যশৃঙ্গ নামক মুনির আশ্রম ছিল। এই স্থান সাধনার খুব অনুকূল জানিয়া শঙ্কর তথায় এক মঠ নির্ম্মাণ করাইলেন। মঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবীস্বরূপে তথায় সরস্বতীদেবীর এক মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিতা হইল। শঙ্করের প্রার্থনায় দেবী "বহুজন-হিতায়, বহুজন-সুখায়" চিরকাল, সেই মূর্ত্তিতে অধিষ্ঠিতা থাকিতে স্বীকৃতা হইলেন। তখন আচার্য্যদেবের শিষ্য সংখ্যা অনেক। শাস্ত্রপাঠ ও সাধনার দ্বারা আদর্শ অনুযায়ী জীবন যাপন করিতে সমর্থ করিবার জন্য তাহাদিগকে লইয়া তিনি কিছুকাল সেই মঠে বাস করিতে লাগিলেন।

একদিন গিরিনামক একজন শান্ত-শিষ্ট অল্পভাষী ব্রাহ্মণ আসিয়া শঙ্করের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। আসিয়াই তিনি গুরুসেবার সমুদয় ভার নিজ স্কন্ধে লইয়া গুরুভ্রাতাদিগকে সাধন-ভজন ও অধ্যয়নের অবসর দিলেন। গুরুর দন্ত-কাষ্ঠ প্রভৃতি আবশ্যকীয় দ্রব্য সংগ্রহ, তাঁহার আসন রচনা, স্নানের সময় বস্ত্রাদি বহন, পরিত্যক্ত বস্ত্র ধৌত করিয়া শুষ্ককরণ প্রভৃতি কার্য্যে সর্ব্বদা গিরি নিযুক্ত থাকিতেন। তাঁহার মুখে কথাটি ছিল না, ছায়ার ন্যায় গুরুর সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন; যেন গুরু-সেবার জন্যই তাঁহার জীবন। কিন্তু শাস্ত্রপাঠে তাঁহার তেমন অনুরাগ দেখা যাইত না।

তখন শঙ্কর-শিষ্যগণ শাস্ত্রচর্চ্চা ও সাধনায় মনপ্রাণ নিয়োজিত করিয়াছেন। মঠে জ্ঞানচর্চ্চা ও জপধ্যানের যেন এক প্রবল স্রোত বহিয়া যাইতেছে। কিন্তু গিরি এই সব বিষয়ে উদাসীন, তিনি গুরুর সেবা লইয়াই ব্যস্ত। তাই গুরুভ্রাতাগণ তাঁহাকে একটু অবজ্ঞার চক্ষেই দেখিতেন। 'গিরি মূর্খ, ও আর কি করিবে? শরীর খাটাইয়া গুরুর যৎসামান্য সেবা করা ব্যতীত তাহার আর কি করণীয় আছে?'—এইরূপ ছিল তাঁহাদের মনের ভাব। একদিন শিষ্যগণ বেদান্ত-পাঠের

জন্য প্রস্তুত হইলে শঙ্কর বলিলেন, "তোমরা একটু অপেক্ষা কর, গিরি কাপড় ধুইতে নদীতে গিয়াছে, সে আসিলে পাঠ আরম্ভ হইবে।" কেহ কেহ ইহাতে ভারী বিরক্ত হইলেন, পদ্মপাদ মুখ ফুটিয়াই গিরির সম্বন্ধে অবজ্ঞা প্রকাশ করিলেন। আচার্য্যদেবের প্রাণে ইহাতে ব্যথা লাগিল। গুরুভক্তি, গুরুসেবা জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায়; ইঁহারা বেদবেদাঙ্গ পারদর্শী তপস্বী হইয়াও অহঙ্কারে এমন অন্ধ হইয়াছেন যে, গুরুসেবাকে অবজ্ঞা করিতেছেন। আচার্য্যদেব শিষ্যগণের কথায় মনোযোগ না দিয়া স্থির হইয়া রহিলেন এবং মনে মনে গিরিকে ব্রহ্মবিদ্যা প্রদান করিলেন। গিরি, নদী হইতে কাপড় ধুইয়া আসিতেছিলেন। সহসা চোখের উপর হইতে যেন এক পর্দ্দা সরিয়া গেল, আর তিনি সমস্ত জগৎ চৈতন্যময় অথবা নিজেকে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপী এক অখণ্ড চৈতন্য বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন। ক্ষণকালের মধ্যে তিনি সর্ব্বশাস্ত্রের সার অবগত হইলেন। তাঁহার বদনমণ্ডল ব্রহ্মতেজে বিভাময় হইয়া উঠিল। তিনি আচার্য্যচরণ সমীপে উপস্থিত হইয়া তোটকছন্দে বেদান্তের সারমর্ম্ম-প্রকাশক কতক-গুলি শ্লোক মুখে মুখে রচনা করিয়া আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। গুরুভ্রাতাগণ অবাক হইলেন, তাঁহাদের

দর্প চূর্ণ হইল। তদবধি গুরুসেবা-পরায়ণ গিরির নাম হইল তোটকাচার্য্য।

এখন লীলার সহায় অন্তরঙ্গ শিষ্যগণ সকলেই আসিয়া জুটিয়াছেন। পদ্মপাদ, সুরেশ্বর, হস্তামলক, তোটকাচার্য্য, সমিৎপাণি, চিদ্‌বিলাস, জ্ঞানকন্দ, বিষ্ণুগুপ্ত, শুদ্ধকীর্ত্তি, ভানুমরীচি, কৃষ্ণদর্শন, বুদ্ধিবিরিঞ্চি, পাদশুদ্ধান্ত, আনন্দগিরি প্রভৃতি যোগী, জ্ঞানী, ভক্ত, পণ্ডিত, সুলেখক, বাগ্মী গুরুগতপ্রাণ শিষ্যগণ অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া গুরুর-কার্য্যসাধনের জন্য জীবন পণ করিয়াছেন। তাঁহারা সাধনা করিয়া ব্রহ্মানন্দ অনুভব করিলেন এবং সর্ব্বশাস্ত্র-পারদর্শী হইয়া অদ্বৈতমতানুকূল বহু গ্রন্থ লিখিলেন। আচার্য্যদেব নিজভাষ্যে বহু বিরুদ্ধ মত খণ্ডন করিতে গিয়া সাধারণের দুর্ব্বোধ্য জটিল শাস্ত্রীয় তর্কযুক্তির অবতারণা করিয়াছিলেন। শিষ্যগণ সেই ভাষ্যের নানারূপ সরল টীকা লিখিলেন।

এই সময় পদ্মপাদের মনে তীর্থ ভ্রমনের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিল। আচার্য্যদেব তীর্থ ভ্রমণের নানা দোষের কথা বলিয়া তাঁহাকে নিবারণ করিলেন; কিন্তু তিনি প্রবোধ মানিলেন না। অবশেষে তাঁহার অতিশয় আগ্রহ দেখিয়া তাঁহাকে যাইতে অনুমতি দিলেন। কয়েক দিবস পরে একদিন আচার্য্যদেব মুখে

মাতৃদুগ্ধের স্বাদ পাইয়া বুঝিতে পাইলেন যে, তাঁহার মাতা তাঁহাকে স্মরণ করিয়াছেন। শিষ্যদিগকে মঠে রাখিয়া তিনি আকাশ-মার্গে সত্বর মায়ের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, মায়ের মৃত্যুকাল উপস্থিত। মাতা দশ বার বৎসর পর পুত্রমুখ দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। শঙ্কর সাক্ষাৎ ভগবতীজ্ঞানে মায়ের সেবা করিতে লাগিলেন। মায়ের সকল দুঃখ দূর হইল। কয়েকদিন পরে, তাঁহার মৃত্যুসময় উপস্থিত হইলে, পূর্ব্বের প্রতিজ্ঞা অনুসারে, শঙ্কর তাঁহাকে শিবরূপ প্রদর্শন করাইলেন। কিন্তু মাতা বিষ্ণুকে ইষ্ট বলিয়া চিন্তা করিতেন সুতরাং এখন তাঁহাকে দেখিতে চাহিলেন। শঙ্করের প্রার্থনায় বিষ্ণু আসিয়া দেখা দিলেন, বিশিষ্টা-দেবী সেই মূর্ত্তি দর্শন করিতে করিতে বৈকুণ্ঠে প্রস্থান করিলেন।

শঙ্কর জ্ঞাতিগণকে মায়ের সৎকারে সাহায্য করিতে বলিলে তাহারা, সাহায্য করা দূরের কথা, শঙ্করকে নানা কটুকথা বলিতে লাগিল, তাঁহার মায়ের অনেক নিন্দা করিল। তাহারা ভাবিল, ‘তিনি অল্প বয়সে না বুঝিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন, এখন সংসারী হইবেন; যে সব সম্পত্তি তাহারা এখন ভোগ করিতেছে, সব কাড়িয়া লইবেন।’ শঙ্কর জ্ঞাতিগণের ব্যবহারে ব্যথিত

হইলেন, বিশেষতঃ মাতৃনিন্দায় তাহাদের উপর ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি একাকী গৃহের প্রাঙ্গণেই মায়ের মৃতদেহের সৎকার করিলেন এবং জ্ঞাতিগণকে দণ্ড দিবার জন্য তিনটি অভিশাপ প্রদান করিলেন। অভিশাপগুলি এই :—

(১) তাহারা গৃহ-প্রাঙ্গণে মৃতদেহের সৎকার করিবে।

(২) কোনও যতি তাহাদের অন্নগ্রহণ করিবে না।

(৩) তাহারা বেদবহির্ভূত হইবে।

জ্ঞাতিগণের তখনও চৈতন্য হইল না। তাহারা ভাবিল, এই বালকের অভিশাপ কে শুনিতে যাইবে? শঙ্কর দেশে আসিয়াছেন শুনিয়া শত শত লোক তাঁহাকে দেখিতে, তাঁহার চরণধূলি লইতে আসিল। রাজাও এই সংবাদ অবগত হইলেন। জ্ঞাতিগণের অসদ্ব্যবহারের কথাও তাঁহার অজ্ঞাত রহিল না। তিনি বড় লজ্জিত হইলেন যে, শঙ্করের মত মহাপুরুষ তাঁহার রাজ্যে আসিয়া অপমানিত হইয়াছেন। শঙ্করের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার জ্ঞাতিগণকে তিনি দণ্ড দিতে চাহিলেন। শঙ্কর বলিলেন, "আমি ইহাদিগকে তিনটি অভিশাপ দিয়াছি। আপনি দেখিবেন যেন উহারা তাহা মানিয়া চলে।" তখন তাঁহার জ্ঞাতিগণের

চমক ভাঙ্গিল। এই সংবাদ পাইয়া তাহারা ভয়ে শঙ্করের চরণে আসিয়া পতিত হইল। তাহাদের কাকুতি-মিনতিতে শঙ্করের মনে দয়া হইল; তিনি তাহাদিগকে বেদপাঠের অধিকার দিয়া তৃতীয় অভিশাপটি মোচন করিলেন। এখনও নাকি কালাডিগ্রামের ব্রাহ্মণগণ অপর দুইটি অভিশাপ মানিয়া চলেন।

শঙ্কর কেরল দেশে ভ্রমণ করিয়া দেশের সামাজিক উন্নতির জন্য নানা সদাচার প্রবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। গুরুগত প্রাণ শিষ্যগণও আসিয়া গুরুর সঙ্গে মিলিত হইলেন। কেরল দেশের প্রচার কার্য্য শেষ করিয়া তিনি পদ্মপাদের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

পদ্মপাদের তীর্থ ভ্রমণের ফল

পদ্মপাদ গুরুর নিকট হইতে বিদায় লইয়া উত্তর-ভারতের তীর্থ সমূহ দর্শনান্তে দক্ষিণাপথে আসিলেন। তথাকার তীর্থ সমূহ দর্শন করিতে করিতে তিনি রামেশ্বরের পথে শ্রীরঙ্গমে উপস্থিত হইলেন। সেখানে তাঁহার মাতুলবাড়ী ছিল। দুই একদিন বিশ্রাম করিবার জন্য তিনি মাতুলের গৃহে অতিথি হইলেন। তাঁহার লিখিত শঙ্করভাষ্যের টীকা-গ্রন্থখানি তাঁহার সঙ্গে ছিল। তাঁহার মাতুল সেই গ্রন্থখানি পাঠ করিলেন। তিনি ছিলেন প্রভাকরের শিষ্য, কুমারিলের মতাবলম্বী।

ভাগিনেয়ের গ্রন্থে তাঁহাদের সম্প্রদায়ের মত সম্পূর্ণরূপে খণ্ডিত দেখিয়া তিনি ঈর্ষায় জ্বলিয়া গেলেন। কিন্তু মনের ভাব গোপন করিয়া গ্রন্থের খুব প্রশংসা করিলেন।

সাম্প্রদায়িকতা মানুষের ধর্ম্ম ত নষ্ট করেই, পরন্তু তাহাকে কখন কখন পশুরও অধম করিয়া তুলে। নিজ মতের বিরোধী টীকা-গ্রন্থের অস্তিত্ব পদ্মপাদাচার্য্যের মাতুলের হৃদয়ে শেলের ন্যায় যেন বিদ্ধ হইয়া রহিল। তাঁহার মনে হইল এই গ্রন্থ নষ্ট করিতে না পারিলে যেন তাঁহার জীবনই বিফল। সত্বর এক সুযোগও উপস্থিত হইল। পদ্মপাদ স্থির করিলেন, রামেশ্বর দর্শন করিয়া আবার শ্রীরঙ্গমে ফিরিয়া আসিবেন এবং তথা হইতে গিয়া গুরুর সঙ্গে মিলিত হইবেন। মাতুল বলিলেন, পুস্তক-খানি সঙ্গে সঙ্গে বহিয়া লাভ কি? এখানে রাখিয়া গেলেই ত চলে। পদ্মপাদ মাতুলের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। মাতুল এবার গ্রন্থখানা হাতে পাইয়া বড়ই হৃষ্ট হইলেন। পদ্মপাদ চলিয়া গেলে মাতুল গ্রন্থখানি নষ্ট করিবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। লোকের চক্ষে ধূলি দিতে হইবে, বিশেষতঃ তেজস্বী তপস্বী ভাগি-নেয়কে কি বলিয়া ভুলাইবেন, এই সব সাত পাঁচ ভাবিয়া অবশেষে ঈর্ষায় উন্মত্ত হইয়া গ্রন্থের অস্তিত্ব লোপ করার

জন্য নিজের ঘরে আগুন দিলেন। ঘরখানা যখন জ্বলিয়া উঠিল তখন কৃত্রিম শোকে আর্ত্তনাদ করিয়া তিনি গ্রাম-বাসীদিগকে সাহায্যের জন্য আহ্বান করিতে লাগিলেন।

পদ্মপাদ রামেশ্বর দর্শন করিয়া ফিরিলে মাতুল গ্রন্থের জন্য বড়ই অনুশোচনা করিতে লাগিলেন। পদ্মপাদ বলিলেন, "এই গ্রন্থের জন্য আপনি শোক করিবেন না। আমি অনায়াসে আবার সেই গ্রন্থখানি রচনা করিতে পারিব।" এই কথা শুনিয়া মাতুল বড়ই ভীত হইলেন। হায়! বেচারী যে-শত্রু সংহার করিতে নিজের ঘরে আগুন দিল, তাহার মূল যে রহিয়া গিয়াছে? এবার তিনি মূল উৎপাটনের জন্য পদ্মপাদের খাদ্যের সঙ্গে এক প্রকার বিষ মাখাইয়া দিলেন। তাহাতে তাঁহার মস্তিষ্ক এমন দুর্ব্বল হইয়া পড়িল যে, আর পুস্তক লিখিবার শক্তি রহিল না। গুরুর উপদেশ ছাড়িয়া নিজের বুদ্ধির অনুসরণ করিবার এই প্রকার ফল হইল দেখিয়া পদ্মপাদ বড়ই লজ্জিত ও মর্ম্মাহত হইলেন।

তিনি নিষ্প্রভ ও অতি বিমর্ষ হইয়া কেরল দেশে গুরুর নিকট উপস্থিত হইলেন। ত্রিকালজ্ঞ আচার্য্যদেব শিষ্যের দুর্দ্দশায় ব্যথিত হইলেন। পদ্মপাদ তাঁহার টীকা-গ্রন্থ গুরুদেবকে একবার পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন। শ্রুতিধর আচার্য্যদেবের তাহা কণ্ঠস্থ ছিল। পদ্মপাদ ইহা জানিতে

পারিয়া আনন্দের সহিত গুরুর নিকট হইতে গ্রন্থখানি আবার লিখিয়া লইলেন।

শঙ্করের অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি সম্বন্ধে আর একটি গল্প আছে। কেরলরাজ তিনখানি নাটক লিখিয়াছিলেন। শঙ্কর সন্ন্যাসী হইবার পূর্ব্বে, শিশুকালে, রাজা গ্রন্থগুলি তাঁহাকে পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন। এখন রাজার সহিত সাক্ষাৎ হইলে শঙ্কর সেই সব গ্রন্থের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। শঙ্করের কিন্তু সবই কণ্ঠস্থ রহিয়াছে। রাজা নাকি তাঁহার নিকট হইতে নাটকগুলি লিখাইয়া লইয়াছিলেন।

অদ্বৈত সত্য

সেতুবন্ধ রামেশ্বরের নিকট মধ্যার্জ্জুন নামক স্থানে এক প্রসিদ্ধ শিবমন্দির ছিল। শঙ্কর সশিষ্য তথায় গিয়া মন্দিরের প্রাঙ্গণে আসন বিস্তার করিলেন এবং বেদের সার অদ্বৈত মত ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। দেশের পণ্ডিত, জ্ঞানী, শিক্ষিত, অশিক্ষিত সর্ব্বসাধারণ সকলেই উপদেশ শুনিতে আসিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য, বাগ্মিতায়, অপূর্ব্ব মুখশ্রীতে সকলে শ্রদ্ধান্বিত, প্রীত ও মোহিত হইলেন।

বাল্যকাল হইতে মানুষ যে প্রকার চিন্তা অভ্যাস করে অধিক বয়সে তাহার পরিবর্ত্তন করিতে বড় কষ্ট

হয়। অধিকাংশ লোকই তাহা পারে না। বিশেষতঃ সামান্য মানুষ নিজকে সমস্ত জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী চৈতন্যময় সত্তা ভাবিতে বড় ভয় পায়, ইহা অসম্ভব মনে করে, আর ভাবে তাহার এত সুখের এত ছোট, 'আমি'টা ছাড়িয়া দিলেই সব গেল ; যদি সবই ব্রহ্ম, তবে ত রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ সবই লোপ পাইবে, তবে আর কি লইয়া থাকিব, এই ভাবিয়া মানুষ চারি দিক অন্ধকার দেখে।

শঙ্কর অকাট্য যুক্তি ও সর্ব্বশাস্ত্রের সমর্থন বাক্য দেখাইয়া সকলের বুদ্ধিকে অদ্বৈতমুখী করিলেন। তথাপি বৃদ্ধগণের হৃদয় সন্দেহ-দোলায় দুলিতে লাগিল। কিন্তু এই ব্রহ্ম জ্যোতির্ম্ময় জ্বলন্ত অনলসম সন্ন্যাসী যুবকের সম্মুখে জোরে শ্বাস ফেলিতেও ভয় হয়, কথা বলা ত দূরের কথা। অবশেষে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সাহসে ভর করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিতে লাগিলেন, "হে মহাত্মন! আপনার অসাধারণ বিদ্যা বুদ্ধি ও বাগ্মিতায় আমরা অবাক হইয়াছি। কিন্তু বিদ্যাবুদ্ধি ও বাগ্মিতায় ধর্ম্ম নির্ণয় হয় না। যাহার বুদ্ধি বেশী সে সব বিষয়েই তাহার মতের অনুকূল যুক্তি দিতে পারে, এমন কি সত্যকে মিথ্যা, মিথ্যাকে সত্য করিতেও মানুষের ক্ষমতা আছে। হয়ত আপনা হইতে অধিক বুদ্ধিমান কেহ আজ উপস্থিত থাকিলে, সে আপনার মত খণ্ডন করিতে পারিত।

তাই আপনার কথায় আমাদের হৃদয়ের সন্দেহ সম্পূর্ণ দূর হইতেছে না। আপনি মহাযোগী সিদ্ধ পুরুষ। ভগবান অবশ্যই আপনার কথা শুনেন। যদি এই মন্দির-স্থিত ভবানীপতি আপনার আহ্বানে আমাদের সাক্ষাতে প্রকটিত হইয়া নিজ মুখে আপনার মতের সত্যতা স্বীকার করেন তবে আমাদের সকল সন্দেহ দূর হয়।"

সভাস্থ সকলে ব্রাহ্মণের বুদ্ধিমত্তায় চমৎকৃত হইলেন, তাঁহার বাক্য সমর্থন করিলেন এবং শঙ্কর কি উত্তর দেন —শুনিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। শঙ্কর বলিলেন, "আমি বিশ্বনাথের ইচ্ছায় এই কার্য্যে প্রবৃত্ত। আপনাদিগকে অদ্বৈতপথে পরিচালিত করা যদি তাঁহার অভিপ্রেত হয়, তবে তিনি অবশ্য আমার বাক্য সমর্থন করিবেন।" এই বলিয়া তিনি মুখে মুখে সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিয়া মধুর কণ্ঠে স্তোত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভক্তিপূর্ণ কবিত্বময় ভাষায় স্তুতি, মন্দির মধ্যে প্রতিধ্বনি তুলিয়া স্থানটিতে এমন একটা গাম্ভীর্য্যের সঞ্চার করিল যে, সকলের শরীর শিহরিয়া

মন এক অজ্ঞাত ভাবোচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ হইয়া

সকলের দৃষ্টি মন্দির মধ্যে নিবদ্ধ, তীব্র আগ্রহে মন একাগ্র। একটা অসম্ভব ঘটনা দেখিবার জন্য তাঁহারা উৎকণ্ঠিত হইয়া রহিলেন। সহসা মন্দির উজ্জ্বল

করিয়া শ্বেতবর্ণ, দ্বিভুজ, ত্রিশূলধারী, ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিহিত, পিঙ্গল জটাযুক্ত, ঢুলু ঢুলু ত্রিলোচন শিব আবির্ভূত হইলেন। চকিতে যেন স্বর্গরাজ্যের দ্বার খুলিয়া গেল, যেন ক্ষণকালের জন্য সকলের জ্ঞান-নয়ন বিকশিত হইল; বিমল আনন্দে সকলের হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল; সেই প্রেমময় মূর্ত্তি ব্যতীত আর কিছু আছে, কি নাই, একথা মনে উঠিল না। মহেশ্বর দক্ষিণ বাহু তুলিয়া, মধুর গম্ভীর স্বরে, "অদ্বৈত সত্য, অদ্বৈত সত্য, অদ্বৈত সত্য" বলিয়াই অন্তর্হিত হইলেন। সকলে সমাধিস্থের ন্যায় স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। ক্ষণকাল পরে তাঁহারা আনন্দে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। তখন জলস্রোতের ন্যায় জনস্রোত শঙ্করের চরণে পতিত হইল।

ক্রকচ-দমন

ভারতের দক্ষিণপ্রান্তে বৌদ্ধ প্রভাব না থাকিলেও বেদচর্চ্চা লুপ্ত হওয়াতে দেব-উপাসকগণ নানাপ্রকার অদ্ভুত মত ও কদর্য্য আচার অবলম্বন করিয়াছিলেন। বৌদ্ধসংঘ ধর্ম্মহীন হইলে, দল বাঁধিবার ঝোঁকে লোকে নানাপ্রকার বিকট সাজ পোষাক ব্যবহার করিতে লাগিল। ক্রমে সেই সব সাজ সজ্জা ধর্ম্মের স্থান গ্রহণ করিল। গায়ে ভস্ম মাখা, জটাজূট ধারণ করা, গায়ে ত্রিশূল ও শিবলিঙ্গের ছাপ মারা বা উল্কি কাটা, রুদ্রাক্ষরের মালায় সর্ব্বাঙ্গ

বেষ্টন করা, সর্ব্বদা হাতে একটা ত্রিশূল লইয়া বেড়ান, এমন কি হাতে শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়া হাতখানা অসাড় করিয়া ফেলা—শৈবদের ধর্ম্ম ছিল। বৈষ্ণবগণ প্রতিযোগিতা করিয়া নানারূপ তিলক শঙ্খ চক্র চিহ্ন প্রভৃতি ধারণ করতঃ বিকট মূর্ত্তি হইয়া ভাবিতেন, ধর্ম্ম-সাধনের আর বড় বেশী বাকী রহিল না। গণপতির বহুপ্রকারের উপাসনা প্রচলিত ছিল; তন্মধ্যে কতকগুলি অকথ্য বর্ব্বরতা পূর্ণ। শঙ্কর সশিষ্য বহু চেষ্টা করিয়া ইহাদিগকে বৈদিক ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন।

বামাচারী কাপালিক প্রভৃতি বক-ধার্ম্মিকগণ মদ্যমাংস ও স্ত্রীলোক লইয়া আমোদ করাকে ধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করিত। অন্যান্য ধর্ম্মে তবু একটু আধটু সদিচ্ছা ছিল কিন্তু ইহারা আমোদ, 'মজা, ফূর্ত্তি' ছাড়া আর কিছুই বুঝিত না। ইহারা 'সিদ্ধাই' লাভের জন্য উৎকট তপস্যা করিত এবং স্বার্থরক্ষার জন্য যে কোনও অসদুপায় অবলম্বন করিতে কুণ্ঠিত হইত না। ইহাদিগকে দমন করিতে শঙ্করকে বড়ই বেগ পাইতে হইয়াছিল। কারণ অশিক্ষিত জনসাধারণকে প্রলোভন দেখাইয়া দলে ভর্ত্তি করিয়া ইহারা খুব প্রভাবশালী হইয়া উঠিয়াছিল।

মণ্ডন বিজয়ের ফলে উত্তর-ভারতে অদ্বৈতমতের আন্দোলন প্রবল হইয়া উঠিল। এখন দক্ষিণপ্রান্তে

বৈদিক ধর্ম্মপ্রচার করিয়া বেরার হইতে মহীশূর পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠিত অবৈদিক মত সমূহের উচ্ছেদ মানসে শঙ্কর প্রচারকার্য্য আরম্ভ করিলেন। বিদর্ভ রাজ্যের (বেরার) অধিকাংশ লোক ভৈরব উপাসক ছিল। শঙ্করের প্রচারের ফলে সেই দেশের রাজা ও অভিজাতবর্গ বেদপথ অবলম্বন করিলেন। তাহাতে অদ্বৈত প্রচারের খুব সুবিধা হইল। পদ্মপাদাদি সন্ন্যাসিগণ রাজ্যের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া অল্প দিনেই সমস্ত রাজ্য বেদমতাবলম্বী করিলেন।

কর্ণাট রাজ্য ছিল কাপালিকদের প্রধান কেন্দ্র। তাহাদের গুরু ক্রকচের নানারূপ সিদ্ধাই ছিল এবং তাহার দল এমন প্রবল ছিল যে, দেশের রাজাকে পর্য্যন্ত সে গ্রাহ্য করিত না। রাজা সুধন্বা ইতিপূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কুমারিলের মত গ্রহণ করেন। শঙ্করের চরিত-কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার পিপাসু হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠে, তিনি তাঁহার চরণ সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। বিদর্ভ বিজয় করিয়া শঙ্কর কর্ণাট রাজ্যে যাইতে চাহিলেন। বিদর্ভরাজ তাহা জানিতে পারিয়া গুরুদেবকে নিবারণ করিয়া বলিলেন যে, সেই রাজ্যে ক্রকচের অত্যন্ত প্রভাব এবং তাহার নানাপ্রকার সিদ্ধাই আছে; সে নিরীহ সন্ন্যাসিদলের মহা অনিষ্ট করিতে পারে; আচার্য্যদেব যেরূপ আপনভোলা, আবার

উগ্র ভৈরবের মত কোনও অসৎ লোক তাঁহার কি অনিষ্ট করিবে, তা কে বলিতে পারে? কর্ণাটরাজ সুধন্বা গুরুদেবের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া আগ্রহের সহিত তাঁহাকে নিজরাজ্যে লইয়া গেলেন এবং স্বয়ং সসৈন্যে তাঁহার দেহ-রক্ষায় নিযুক্ত রহিলেন।

ক্রকচ আচার্য্যদেবের আগমন বার্ত্তা পাইয়া তাঁহাকে নিজধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য আসিল। তাহার সমস্ত দেহ ভস্মমাখা, মাথায় জটা, পরিধানে রক্তবস্ত্র। মদ্যপানে ঢুলু ঢুলু লাল চোখ, একহাতে মদ্য খাইবার জন্য মানুষের মাথার খুলি, আর একহাতে ত্রিশূল। একে এই বীভৎস-মূর্ত্তি, তাহাতে আবার যখন ঘোরতর অশ্লীল ও অসভ্য মত ব্যাখ্যা করিতে লাগিল, তখন শঙ্কর-শিষ্যগণ কুপিত হইয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিলেন। ক্রকচ অপমানিত হইয়া তাহার মাতালের দল লইয়া যুদ্ধ করিতে আসিল। তাহারা হয়ত বুঝিয়াছিল যে শাস্ত্রে ত পারিব না, শস্ত্র ধরিয়া শেষ চেষ্টাটা করিয়া দেখিতে হইবে। রাজা সুধন্বা ত পূর্ব্বেই প্রস্তুত ছিলেন। তাঁহার সুশিক্ষিত সৈন্যদলের আক্রমণে কাপালিকগণ পরাস্ত ও নিহত হইল। ক্রকচ অবশেষে তাহার ইষ্টদেব ভৈরবকে স্মরণ করিল। ভৈরব আভির্ভূত হইলে সে শঙ্করকে বধ করিবার জন্য প্রার্থনা করিল। শিবানুচর ভৈরব ইহাতে

ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন। কাহারও মতে ভৈরব ত্রিশূলাঘাতে ক্রকচের মুণ্ডপাত করেন। ক্রকচের মৃত্যু বা পরাজয়ে তাহার শিষ্যগণ ভয়ে, বিস্ময়ে অথবা ভক্তিতে শঙ্করের চরণে শরণ লইল। অন্যান্য অনেক অবৈদিক মতাবলম্বিগণ শঙ্করের ঈদৃশ প্রভাব দেখিয়া সহজেই অদ্বৈত মত অবলম্বন করিল। রাজা সুধন্বা গুরুর দেহ রক্ষা করিবার জন্য সৈন্যসহ আচার্য্যদেবের সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

কুকুরোপাসনা-নিবারণ

মল্লপুর নামক স্থানে এক চমৎকার ধর্ম্মসম্প্রদায় ছিল। তাহারা ভগবানকে কুকুর-বাহন মল্লারিরূপে উপাসনা করিত। বেদে সর্ব্বব্যাপী ভগবানের একটি স্তবে একস্থলে "শ্বভ্যো নমঃ, শ্বপতিভ্যো নমঃ" বলিয়া ঈশ্বরকেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কিন্তু ইহারা সেই বেদবাক্যের কদর্থ করিয়া কুকুরের পূজা করিত, কুকুরের ন্যায় শব্দ করিত এবং সর্ব্বদা নৃত্যগীত করা ছিল তাহাদের ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ। ইহারা ব্রাহ্মণ ছিল। শঙ্করের প্রচারের ফলে ইহাদের চৈতন্য হইল। তাঁহার শিষ্যগণ ইহাদের মস্তক মুণ্ডন করাইয়া দশহাজার বার স্নান করাইলেন, তারপর মাথায় কাদা মাখাইয়া আবার এক শতবার স্নান, আবার শতবার স্নান ও প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া

তাহাদের দেহমন শুদ্ধ করতঃ ব্রাহ্মনের আচার শিক্ষা দিলেন।

আচার্য্যদেব ষোলবৎসর ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া অদ্বৈত মত প্রচার করিলেন। এই মহাদেশের ন্যায় ভারত ভূমিতে কত ভাষা কত ধর্ম্ম ও কত আচার থাকা সম্ভব তাহা বর্ত্তমান অবস্থা বিবেচনা করিলেই বুঝা যাইবে। প্রবল বাত্যা যেমন আকাশের মেঘ সমূহ ছিন্ন-বিছিন্ন করিয়া চারি দিকে বিক্ষিপ্ত করে, কুমারিলভট্ট তেমনই বৌদ্ধগণকে পরাজিত, নিহত ও বিতাড়িত করিলে ভারতাকাশে বেদ-সূর্য্যের উদয় হয়। বৌদ্ধ ধর্ম্মের ছায়ায় যে সব অপধর্ম্ম, ধর্ম্মবিজ্ঞান-বহির্ভূত মত পরগাছার মত জন্মিয়াছিল, বৌদ্ধ ধর্ম্মের সহিত তাহারা কেন্দ্র হইতে বিতাড়িত হইয়া দূরপ্রান্তে আড়ালে আত্মরক্ষা করিবার চেষ্টা করিল। বামাচারী, কাপালিকগণ পূর্ব্বসীমান্তে কামরূপে ও দক্ষিণদিকে মহীশূর অঞ্চলে কেন্দ্র করিয়া তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিতে লাগিল। বোধ হয়, জৈনগণও বিতাড়িত হইয়া পশ্চিম সীমান্তে বাহ্লীক দেশে আশ্রয় লইয়া ছিল। আচার্য্যদেব এই সব প্রান্তসীমা পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া অদ্বৈত মত প্রচার করিলেন। তাঁহাকে কত মত কত সম্প্রদায়ের যে সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল তাহার অল্পই জানা গিয়াছে; এই ক্ষুদ্র পুস্তকে তাহারও

সবগুলির উল্লেখ করা সম্ভব নহে। ভারতকে ঐহিকতা হইতে উদ্ধার করার জন্য ভগবান এই যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; ইহার ভিতর দিয়া তিনিই সমস্ত ভারতে মানবীয় নিয়মে বেদ-বিজ্ঞান প্রচার করিলেন।

কামরূপে

বাহ্লীক-বাসী জৈনগণ বিচারে পরাস্ত হইলে তাহাদের অনেকে অদ্বৈত মত গ্রহণ করিল। কামরূপে শাক্ত-প্রধান অভিনব গুপ্ত বেদান্ত সূত্রের এক শাক্তভাষ্য রচনা করেন। শঙ্কর তথায় উপস্থিত হইলে, উভয়ে কয়েকদিন ধরিয়া বিচার হয়। অভিনব গুপ্ত পরাজিত হইয়া কপটভাবে আচার্য্যদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল।

ঈর্ষায় তাহার হৃদয় জ্বলিয়া যাইতেছিল; তাই সে 'অভিচার' ক্রিয়া করিয়া আচার্য্যদেবের নিষ্পাপ দেহে 'ভগন্দর' রোগ উৎপাদন করিল। শিষ্যগণ প্রাণপণ যত্নে গুরুর শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। তোটকাচার্য্য-গুরুর সেবার জন্য আহার নিদ্রা ভুলিলেন। আচার্য্য-দেব রোগের কারণ জানিতেন, তাই তিনি কোনও রূপ চিকিৎসা করাইতে সম্মত হইলেন না। অবশেষে শিষ্য-গণের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে ঔষধ ব্যবহার করিলেন। কিন্তু রোগের বিন্দুমাত্র উপশম হইল না। শিষ্যগণ অত্যন্ত ভীত হইলেন। পদ্মপাদ যোগশক্তি বলে জানিতে

পারিলেন যে, ইহা অভিচার-জাত রোগ, চিকিৎসায় সারিবার নহে। তখন তিনি অভিচারকারীর দেহে এই রোগ ফিরাইয়া দিবার জন্য মন্ত্রজপ করিতে লাগিলেন। আচার্য্যদেব হিংসা করিতে বারবার নিষেধ করিলেন। কিন্তু গুরুভক্ত গুরুর জন্য গুরুর আদেশ লঙ্ঘন করিলেন। তাঁহার মন্ত্রবলে ভগন্দর রোগ আচার্য্যদেবের দেহ হইতে অভিনব গুপ্তের দেহে ফিরিয়া গেল। শঙ্কর সুস্থ হইলেন, আর অভিনবগুপ্ত যন্ত্রনায় ছট্‌ফট করিতে করিতে প্রাণ ত্যাগ করিল।

বিদ্যাপীঠে আরোহণ

ভূস্বর্গ কাশ্মীর তখন বিদ্যাচর্চ্চার জন্য ভারত-বিখ্যাত। সেখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল তাহাতে সর্ব্ববিধ শাস্ত্রের চর্চ্চা হইত। আর ছিল দেবী-সরস্বতীর এক মন্দির। তাহার চারিদিকে চারিদ্বার ও প্রত্যেক দ্বারের সম্মুখে এক একটি মণ্ডপ। মন্দির মধ্যে একটি আসন, বিদ্যাভদ্রাসন বা সারদাপীঠ নামে অভিহিত হইত। মন্দির স্থাপনকারী এই নিয়ম করেন যে, মন্দিরের চারি-দিকের দেশসমূহ হইতে আগত যে পণ্ডিত মন্দির-রক্ষক পণ্ডিতমণ্ডলীর প্রশ্নের, সন্তোষ-জনক উত্তর দিয়া নিজ দেশাভিমুখী দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া উক্ত পীঠে আরোহণ করিতে পারিবেন, তিনি সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া গণ্য

হইবেন। ইতিপূর্ব্বে পশ্চিম, উত্তর ও পূর্ব্ব দেশীয় পণ্ডিতগণ পূর্ব্বোক্ত নিয়মে নিজ দেশাভিমুখী দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া সর্ব্বজ্ঞ খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। দক্ষিণদেশীয় কোনও পণ্ডিত এ যাবৎ দক্ষিণদ্বার উদ্‌ঘাটন করিতে পারেন নাই।

শঙ্কর ভাবিলেন, ঐ পীঠে আরোহণ করিয়া সর্ব্বজ্ঞ খ্যাতি লাভ করিলে অনায়াসে কাশ্মীর অঞ্চলে অদ্বৈত মত গৃহীত হইবে, ভারতে সর্ব্বত্র অদ্বৈত মতের গৌরব বাড়িবে এবং দাক্ষিণাত্যের অগৌরব দূর হইবে। এই ভাবিয়া তিনি সশিষ্য কাশ্মীরে গিয়া শারদাপীঠের দক্ষিণ-দ্বার উদ্‌ঘাটন করিতে উদ্যত হইলেন। মন্দিররক্ষক পণ্ডিতগণ তাঁহাকে বাধা দিয়া বিচারে আহ্বান করিলেন। শঙ্কর অবলীলা ক্রমে একে একে অতি সংক্ষিপ্ত ভাষায় পণ্ডিতগণের প্রশ্ন সমূহের উপযুক্ত উত্তর দিয়া সকলকেই নিরস্ত করিলেন। অতঃপর পীঠে আরোহণ করতঃ সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া খ্যাতি লাভ করিলেন। অল্প সময় মধ্যে কাশ্মীরে অদ্বৈত মত প্রচার হইল।

লীলাবসান

কাশ্মীরে প্রচারকার্য্য শেষ হইলে শঙ্কর তাঁহার কর্ত্তব্য শেষ হইয়াছে বলিয়া অনুভব করিলেন। ব্যাস-দত্ত আয়ুও নিঃশেষ প্রায়। ইতিপূর্ব্বে নানা স্থানে প্রচারকেন্দ্র

স্বরূপ মঠ-সমূহ নির্ম্মিত হইয়াছিল ; এখন তিনি শিষ্য-গণকে তথায় যাইয়া প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত হইতে আদেশ করিলেন। শিষ্যগণ বুঝিতে পারিলেন, জীবনসর্ব্বস্ব গুরুদেবের সঙ্গে এই শেষ দেখা। এই আদেশ তাঁহাদের পক্ষে কিরূপ মর্ম্মান্তিক তাহা বলিয়া বুঝান অসম্ভব। তাঁহারা গুরুর সঙ্গত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন না। দয়াময় আচার্য্যদেব শিষ্য-প্রেমে বাধ্য হইয়া কিছুকাল কেদারনাথ ধামে বাস করিয়া শিষ্যদিগকে শান্ত করতঃ পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে প্রেরণ করিলেন এবং স্বয়ং কৈলাস ধামে গিয়া মহাসমাধি যোগে শিবত্ব লাভ করিলেন।

উপসংহার

বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বেদপ্রবর্ত্তক ভগবান ভৃগুরাম, ভারতের পশ্চিম-দক্ষিণ-সীমান্তে ব্রহ্মতেজের এক অনলকণা সযত্নে রক্ষা করেন। তাহা এখন দিগ্‌দাহী বহ্নিকূটরূপে ভারতের সমূহ অজ্ঞান, অধর্ম্ম, অপবিত্রতা দহন করিল। সর্ব্বজ্ঞ ভগবান শঙ্করাচার্য্য দীর্ঘ যোড়শবৎসর কাল ভারতের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া কেবল অদ্বৈত মত প্রচার করিয়াই নিরস্ত হন নাই; তিনি ভারতের ধর্ম্মরক্ষার স্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন। নিম্নে তাহার কয়েকটি প্রধান কার্য্যের উল্লেখ করা হইল।

(১) দেবী সরস্বতীকে সন্তুষ্টা করিয়া বহুজনহিতায় চিরকালের জন্য শৃঙ্গেরী মঠে প্রতিষ্ঠা।

(২) বেদাচার ও শাস্ত্র রক্ষার জন্য সদ্‌-ব্রাহ্মণসম্প্রদায় গঠন।

(৩) জ্ঞানচর্চ্চা ও ধর্ম্মপ্রচারের জন্য সন্ন্যাসিসম্প্রদায় গঠন।

(৪) মানুষের অনুমান যাহাতে ধর্ম্মের স্থান অধিকার না করে তজ্জন্য অকাট্য যুক্তি প্রমাণের দ্বারা ধর্ম্মের চূড়ান্ত মীমাংসা স্বরূপ ভাষ্য রচনা।

(৫) তীর্থ সমূহের উদ্ধার, দেবতার চৈতন্য সম্পাদন ও সেবা পূজার ব্যবস্থা।

(৬) ধর্ম্মের আচার-প্রচার-পরিরক্ষণের জন্য স্থানে স্থানে, বিশেষতঃ ভারতের চারি দিকে চারিটি মঠ স্থাপন।

শৃঙ্গেরী মঠে মা সরস্বতী দেবী শঙ্করের তপস্যায় চিরবিদ্যমানা। যখনই ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হয়, তখনই এই মঠের সাধু-সম্প্রদায়ে ভগবান আবির্ভূত হইয়া ধর্ম্ম রক্ষা করেন। পূর্ণাবতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের মন্ত্রদাতা ঈশ্বর পুরী ও সন্ন্যাসদাতা কেশব ভারতী শৃঙ্গেরী মঠের "ভূর্বার" সম্প্রদায় ভুক্ত। তাঁহার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামটি এই সম্প্রদায়ের ব্রহ্মচারী পদবী বোধক। আবার যখন সমস্ত পৃথিবী ইহসর্ব্বস্বতার অনলে দগ্ধ হইতে চলিল তখন "ভূর্বার" সম্প্রদায়ের আচার্য্য তোতাপুরী গুরুপরম্পরাগত ব্রহ্মবিদ্যা শ্রীমদ্ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে প্রদান করিয়া মানুষের জন্য মুক্তিরদ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন।

আচার্য্যদেব বেদধর্ম্ম রক্ষার দুর্গ স্বরূপ ভারতের চারি প্রান্তে চারিটি প্রধান মঠ স্থাপন করেন। পশ্চিমে দ্বারকা ক্ষেত্রে সারদামঠ, উত্তরে বদরিকাশ্রমে যোগীমঠ বা জ্যোতির্ম্মঠ, পূর্ব্বে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে ভোগবর্দ্ধন বা গোবর্দ্ধনমঠ, এবং দক্ষিণে রামেশ্বর ক্ষেত্রে শৃঙ্গগিরি বা শৃঙ্গেরী

মঠ। চারিজন প্রধান শিষ্যের নেতৃত্বে সন্ন্যাসী সম্প্রদায়কে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া ভারতের চারি অংশে তাঁহাদের কর্ম্মক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট করা হয়। তাঁহাদের মধ্যে দশটি আখ্যা থাকায় তাঁহাদিগকে "দশনামী" সম্প্রদায় বলে। প্রত্যেক মঠে ধর্ম্মের আচার, প্রচার ও পরিবেক্ষণের ব্যবস্থা আছে।

ব্রাহ্মণগণ সংস্কারহীন, শাস্ত্রজ্ঞানহীন, ভগবদ্‌ভক্তি-বিহীন, কেহ বা বৌদ্ধ ভাবাপন্ন হইয়াছিলেন। সমাজে তাঁহাদের সম্মান বা প্রভাব কিছুই ছিল না। আচার্য্য-দেব তাঁহাদিগকে বৈদিক সংস্কারে সংস্কৃত করিয়া, শিষ্য-গণের দ্বারা সদাচার শিক্ষা দিয়া আবার সমাজ-শিক্ষক-পদে স্থাপিত করেন।

তিনি যেখানেই যাইতেন সেখানকার তীর্থ ও দেবালয় সমূহে গিয়া দেবতার পূজা অর্চ্চনা ও স্তোত্র রচনা করিয়া দেবতার চৈতন্য সম্পাদন করিতেন এবং সেবা পূজার সুব্যবস্থা করিতেন। দেব-দেবীগণের যে সব স্তুতি তিনি মুখে মুখে রচনা করিয়া আবৃত্তি করিয়াছিলেন, এখন পর্য্যন্ত আসমুদ্রহিমাচলবাসী তাহা পাঠ করিয়া ধন্য হইতেছে। দেবপূজার সামান্য বিধিতেও 'সোঽহং' চিন্তা করিবার যে ব্যবস্থা দৃষ্ট হয় তাহা এই অমৃতবীর্য্য মহাপুরুষেরই বিধান। ভারতের প্রায় অধিকাংশ তীর্থ তাঁহার পাদস্পর্শে বৌদ্ধবামাচার মুক্ত হইয়া তীর্থত্ব লাভ

করে। পুরুষোত্তম ক্ষেত্র যে কি কদর্য্য আচারের স্থল হইয়াছিল তাহার নিদর্শন এখনও বিদ্যমান। এই পুরুষ-সিংহ কদাচারিগণকে বিতাড়িত করিয়া তথায় ভোগবর্দ্ধন মঠ স্থাপন করেন। পরে তাহা বর্ত্তমান গোবর্দ্ধন মঠে স্থানান্তরিত হইয়াছে। কাশীধাম সম্বন্ধে কিংবদন্তির কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে।

ভগবান শঙ্করাচার্য্যের কৃপায় পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্ম্মমত সমূহের কলহ কোলাহল নীরব হইল। তাঁহার আধ্যাত্মিক শক্তিবলে এবং শিষ্যগণের প্রচারের ফলে মানুষ অদ্বৈততত্ত্বে লক্ষ্য রাখিয়া শত মতে শত পথে ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ লাভে কৃতার্থ হইতে লাগিল। তাহাদের দুঃখতাপ রহিল না, যেন সত্যযুগের পুনরভ্যুদয় হইল।

—

৬
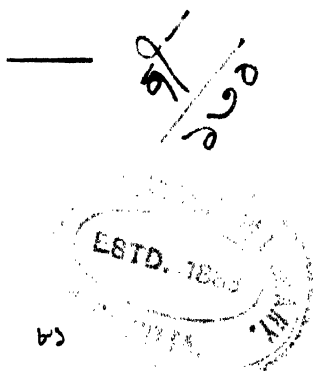
মঠের বিবরণ

মঠের নাম	শৃঙ্গেরী মঠ	গোবর্দ্ধন মঠ	সারদা মঠ	জ্যোতির্ম্মঠ
আচার্য্য	পৃথ্বীধর বা সুরেশ্বর	পদ্মপাদ	বিশ্বরূপ বা হস্তামলক	তোটকাচার্য
সম্প্রদায়	ভূমিবার	দোনবার	কীটবার	আনন্দবার
পদবী	সরস্বতী, পুরী, ভারতী	বন, অরণ্য	তীর্থ, আশ্রম,	গিরি, পর্ব্বত, সাগর
ব্রহ্মচারী	চেতন	প্রকাশক	স্বরূপ	নন্দ
বেদ	যজুঃ	ঋক্	সাম	অথর্ব্ব
তীর্থ	তুঙ্গভদ্রা	মহোদধি	গোমতী	অলকনন্দা
অধিষ্ঠাতা	আদি বরাহ	জগন্নাথ	সিদ্ধেশ্বর	নারায়ণ
অধিষ্ঠাত্রী	কামাক্ষী	বিমলা	ভদ্রকালী	পুণ্যাগিরি

সাহিত্য, ১৩০৮ বাং, হিমারণ্য নামক প্রবন্ধ হইতে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত করিয়া গৃহীত। প্রবন্ধের লেখক ৺স্বামী রামানন্দ ভারতী মহারাজ। ইতি—গ্রন্থকার।

সমাপ্ত।